সহিতে পারি না! নরকের অন্ধকার আমার হৃদয়ের সুপবিত্র সমুজ্জ্বল আলো নিভাইয়া দিয়াছে—সে আলো জ্বালাইয়া দাও—প্রিয়তম।”

এ আগন্তুক আর কেহই নহেন, বীরকুল-কেশরী আলিকুলী খাঁ, ওরফে—সের আফগান।

আলিকুলী মেহেরকে আলিঙ্গন নিপীড়িত করিয়া বলিল—“তুমি আমার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী, পদতল ত তোমার স্থান নয়। এস—এই সন্তাপপীড়িত বক্ষে সংলগ্ন হইয়া আমার সকল ব্যথা দূর কর।”

মেহের আলিকুলীর কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া বলিল—“আর কত দিন এ জ্বালা সহিব প্রিয়তম?”

সের আফগান—ত্রাস্তভাবে বলিল—“কিসের জ্বালা মেহের।”

“কিসের জ্বালা—তা ঠিক বলিতে পারি না কিন্তু তাহাতে আমার প্রাণের প্রত্যেক স্তর তুষানলের আগুনে পুড়িতেছে।”

“তুমি কি সেলিমের চিন্তা করিতেছিলে।”

“মিথ্যা বলিব না, সত্যই তাই। কিন্তু কি হইবে—আলি?”

“কিসের কি হইবে!”

“তোমার—আর আমার?”

“আমার যাহা হইবার, তাহা ত হইয়া গিয়াছে। আমার হৃদয়ে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই?”

“আর আমার হৃদয়ে তুমিই যে আলো করিয়া আছ আলি! কিন্তু সেলিমের চিন্তা যে যখন তখন আমার এ সাধের আলো নিভাইয়া দেয়।”

“একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।”

“স্বচ্ছন্দে করিতে পার।”

মেহের আলিকুলী খাঁর কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া বলিল
"আর কতদিন এ জ্বালা সহিব প্রিয়তম" ?

"খোদার কসম! সেই আল্লাই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সত্য বল তুমি সেলিমকে ভাল বাসিয়াছ কি?"

"যদি বলি ভাল বাসিয়াছি—"

"তাহা হইলে আমি তোমার পথের কণ্টক হইব না। তোমার হৃদয়ের সুখ নষ্ট করিব না। তোমার ভবিষ্যৎকে অন্ধকারময় করিব না। তুমি স্বচ্ছন্দে পাটরাণী হইতে পার। হিন্দুস্থানের অধীশ্বরী হইয়া দিল্লীর মসনদে বসিলে, আমি প্রজারূপে তোমার আদেশ পালনে ধন্য হইব।"

মেহের আর থাকিতে পারিল না। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"তুমি মানুষ নও—দেবতা। তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারে এমন সৌভাগ্যবতী রমণী এ দুনিয়ায় নাই। আমি অতি পাপিষ্ঠা! তোমার মনোভাব জানিবার জন্য একটা মহা মিথ্যা কথা বলিয়াছি। পাপের উপর পাপ করিতেছি। দেবতা! দেবতা! আমায় মার্জ্জনা কর। তুমি দেবতা—সেলিম পিশাচ। তুমি মহত্ত্বের উজ্জ্বল প্রতিমা, সেলিম নীচতার মূর্ত্তি। তুমি স্বর্গ—সেলিম নরক। স্বর্গে হইতে কে নরকে যাইতে চায় আলি? মোগলসাম্রাজ্য অতল জলে নিমগ্ন হউক, রত্নখচিত মসনদ রসাতলে যাক্, আমার ভবিষ্যতের সুখ ঐশ্বর্য্য, কল্পনা আকাশ-কুসুমের মত বিলয় হউক—কিছুই চাহি না—চাই তোমায়। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আমায় সঙ্গে নাও,—চল দুজনে আগরা হইতে পলাইয়া যাই। পাতার কুটীরের মধ্যে আমরা নূতন স্বর্গ তৈয়ার করিব।"

একজন এই সময়ে দ্বারান্তরালে থাকিয়া এই সব ব্যাপার দেখিতেছিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"মেহের! তোমার এ আশা পূর্ণ হউক।" এই কথা বলিয়াই সে মূর্ত্তি সহসা দ্বার পথ হইতে অদৃশ্য হইল।

পাঠক! এই বিশাল দেহ ব্যক্তিকে চিনিয়াছেন কি? ইনিই গিয়াসবেগ। এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া কন্যার প্রকৃত মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। কন্যা এবং ভবিষ্যৎ জামাতার গুপ্ত প্রেমালাপ শুনিয়া, তিনি যে একটু অন্যায় কাজ করিয়াছেন—একটু পাপ করিয়াছেন—তাহার জন্য নিজের কক্ষে গিয়া ঈশ্বরের নিকট মার্জ্জনা চাহিলেন। অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"মহিমাময় মেহেরবান খোদা! আমার কন্যা যে সের আফগানের মত বীরকে—প্রাণ দিয়া ভালবাসে, সেলিমকে ঘৃণা করে, এ ঘটনা আমার এ উজীরির অপেক্ষাও বহুমূল্য সম্পদ। আমি যত শীঘ্র পারি, ইহাদের পরিণীত করিব। ইহাতে আমায় পথের ভিখারী হইতে হয়, জীবিকার জন্য গজে কাপড় মাপিয়া ইরানের পথে পথে ঘুরিতে হয়—তাহাও শ্রেয়ঃ!"

এদিকে এমন গুপ্তভাবে এ ব্যাপার ঘটিয়া গেল, যে মেহের ও আলি কুলী তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

মেহেরের প্রাণে তখন প্রচুর শান্তি। সে একটী বীণ্ লইয়া—সুকণ্ঠে সংগীত আরম্ভ করিল। সুর, রাগ, মূর্চ্ছনায় মিশ্রিত, সে বাসন্তী-কোকিলের পূর্ণ পঞ্চমে, সেই গৃহকক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আলিকুলী খাঁ, এক দৃষ্টে মেহেরের নিরুপম রূপরাশি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। শতবার দেখিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি হইল না। সহস্র যুগ এই ভাবে দেখিলেও বোধ হয় তৃপ্তি হইবে না।

এই সুখের, এই চিত্ত প্রসন্নতার, এই আনন্দের সময়ে, সহসা এক বাঁদী আসিয়া কুর্ণীশ করিয়া আলি কুলীকে বলিলেন—"সাহেব আলম আপনার জন্য খানার ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন।"

এই কথা শুনিয়া, সের সাহেব গুলেস্তাঁর একটী কবিতা

আওড়াইয়া সহাস্যমুখে মেহেরের মুখচুম্বন করিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহার কবিতার একাংশ—

"ভেবেছিনু নিশি মোর,
সঙ্গীতে হইবে ভোর,
সুখের স্বপন ঘোরে, কাটিবে জীবন।
উষার আলোক মালা
ঘটালে বিচ্ছেদ জ্বালা
সরমে মরম-ভাষা হল না স্ফুরণ।

তখনও মেহেরের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দূর-শ্রুত সঙ্গীত কাকলীর মত, এই প্রেমাভিব্যক্তিময় ভাষা কত সুন্দর! কত চিত্ত তৃপ্তিকর। হায়! এ তৃপ্তি কি জীবনে আর কখনও ঘটিবে!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সাহ-ইন-সাহ, দিল্লীর-তক্তের, ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী—সুলতান সেলিম, এক স্বর্ণখচিত কারুকার্য্যময় মছলন্দের উপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া আপন মনে কি চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত। সম্মুখে স্বর্ণ-পাত্রে তুষারসিক্ত, গোলাপবাসিত, সরবৎ ধীরে ধীরে শৈত্য-সঞ্চয় করিতেছিল—আর সাহাজাদা কখন তাহাকে আদর করিয়া হাতে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করেন, এই আশায় আরও দ্রবময়ী হইতেছিল।

সাহ-সেলিমের সম্মুখে একখণ্ড লোহিত-বর্ণের কাগজ। নিকটে একটী স্বর্ণমণ্ডিত লেখনী ও রৌপ্যময় মসী-পাত্র। সেলিম লোহিত পত্র খণ্ডে কয়েক ছত্র মাত্র লিখিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সেই চিন্তাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুনরায় সেই স্বর্ণ-লেখনী করে তুলিয়া লইয়া আবার সেই লোহিতবর্ণ পত্রের উপর কি লিখিতে লাগিলেন।

লেখা শেষ হইলে, সেই সরবৎ পাত্র মুখে তুলিয়া তাহা হইতে সুবাসিত স্নিগ্ধ বারি পান করিলেন। তাঁহার সুন্দর ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। এমন সময়ে একজন সুগঠিতকায় যুবক সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"বন্দেগী—সাহেব-আলম! এক মনে কি লিখিতেছেন?"

সুলতান—আগন্তুকের দিকে কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি-ক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ভালই হইয়াছে। মির্জ্জা তুমি ঠিক সময়েই আসিয়াছ।"

আগন্তুকের নাম—"মির্জ্জা মহম্মদ এফেন্দি। মির্জ্জা এফেন্দি সুলতান সেলিমের বিশ্বস্ত অনুচর। অনুচরই বা বলি কেন—বিশ্বস্ত বন্ধু। সুলতান—যৌবন বিকাশের পর, আজমন্দ যাহা কিছু করিয়াছেন বা করেন, সকল কাজেই এফেন্দির মতামত গ্রহণ করেন। তাহার সহিত পরামর্শ করেন।

মেহের ঘটিত সমস্ত কথাই, এই মির্জ্জা সাহেব জানিতেন। সেলিম তাহার নিকট কোন কিছুই গোপন করেন নাই। কাজেই মির্জ্জা সাহেব আসন গ্রহণ করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন—"জনাব! ব্যাপার কি? মেহেরকে পত্র লিখিতেছেন না কি?"

সেলিম সহাস্যমুখে বলিলেন—"হাঁ ঠিক ধরিয়াছ। কিন্তু যাহা লিখিয়াছি, তাহা কি তাহার মনে ধরিবে? কবিতায় কি মনের ভাব ঠিক প্রকাশ করিতে পারিব। এটা পড়িয়া দেখ।"

মির্জ্জা সাহেব বলিলেন—"এটা জনাবের নিজের লেখা। আপনার মুখে বড়ই সুন্দর শোনাইবে। একবার পড়ুন দেখি।

সেলিম এই কথায় প্রোৎসাহিত চিত্তে নিম্ন লিখিত কবিতাটী পাঠ করিলেন—

"বুলবুল্ কি জিন্দ্গী, গুল্ ও গুলজার দেখ্না—
অওর মেরি জিন্দ্গী, তেরা দিদার দেখ্না।

লগ্‌জা গলেসে তব আব্‌, আয়ে নাজ্‌নি নেহি
হয়্‌ হয়্‌ খোদাকে-ওয়াস্তে, মত্‌কর্‌ নহিনহি।" *

মির্জ্জা-মহম্মদ এই চারিটী ছত্র শুনিবামাত্রই আনন্দের সহিত বলিল "খোদার কসম্—জাঁহাপনা! এ যেন গুলেস্তাঁর উপরে উঠিয়াছে। জনাব যে কবিতা রচনায় এতদূর সিদ্ধহস্ত, তা জানিতাম না। আপনার নিজের জীবন-বৃত্তান্ত যাহা লিখিতেছেন, তাহাতে যদি মেহেরের ঘটনা লেখেন, তাহা হইলে এই কবিতাটী তাহাতে রাখা উচিত।"

সেলিম এ তোষামোদে বড়ই প্রীত হইলেন।

যুবরাজ সেলিম, মির্জ্জা মহম্মদের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আদরে তাহার পৃষ্ঠের উপর মৃদুভাবে আঘাত করিয়া বলিলেন—"মির্জ্জা! এ কবিতা কি—মেহেরের চিত্ত তুষ্টি করিবে?"

মির্জ্জা বলিল—"এততেও যদি না করে, এ প্রেম পূর্ণ, প্রাণের কথায় যদি তাহার প্রাণ না গলে, তাহা হইলে বুঝিব—সে বৃথা রমণী হইয়া জন্মিয়াছে। কিন্তু বিলম্বে প্রয়োজন কি? পত্র খানি শীঘ্র পাঠাইয়া দিন।"

সেলিম একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন—"হুঁ—তারপর?"

মির্জ্জা বুঝিল, সাহাজাদা, বড়ই অন্যমনস্ক হইয়াছেন। সেইজন্য পুনরায় বলিলেন—"সাহেব আলম! একটা ভাল খপর আছে।"

সেলিম। কি—

মির্জ্জা। আজ আমীর-উদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

সেলিম। তারপর? কোন কথা হইয়াছিল কি?

---

* বুলবুল প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পুষ্প পাইলে যেমন খুসী হয়, আর কিছুই চাহে না, সেইরূপ তোমার ঐ সুন্দর মুখের ও সুন্দর চক্ষু দুটীর দিকে দেখাই আমার সুখ। হে প্রিয়! অয়ি! কোমলাঙ্গী খোদার দোহাই তুমি আমার কণ্ঠলগ্না হও। নিঠুরের মত—"আর না—না—বলিও না।"

মির্জ্জা। হাঁ—কথা কহিবার জন্যই ত আমার সেখানে যাওয়া।

সেলিম। তুমি সরাসর আমার কথাটা তাহাকে বলিয়া ফেলিলে! কি সর্ব্বনাশ!

মির্জ্জা। জনাব কি আমাকে এতই বোকা ঠাওরাইয়াছেন? হুজুরালি দিল্লীর তক্তে বসিলে, এ বান্দাকে যে উজিরি করিতে হইবে?

সেলিম। গিয়াস সাহেব সব কথা শুনিয়া কি বলিলেন?

মির্জ্জা। তাঁহার কোন আপত্তি নাই। তবে-তিনি এই কথাটা খালি বলিলেন—কোন্ পিতা কন্যার সৌভাগ্য কামনা না করে? কিন্তু বাদসাহের মত না হইলে—

সেলিম। বাদসাহ নিশ্চয়ই মত করিবেন। না করেন, এ সাম্রাজ্যের পাটরাণী, আমার গর্ভধারিণী যোধাবাই, তাঁহার মত করাইবেন। তাহাতে না হয়—যে কোন উপায়ে হৌক আমি মেহেরকে চাই, সিংহাসন চাহি না।

মির্জ্জা। ছিঃ! ছিঃ! জনাব! একেবারে অতটা ভাবিয়া পড়া ভাল কথা নয়। কিসের ভয় আপনার? আমার কথা শুনুন। মেহের আপনার। সেই বর্ব্বর আলি-কুলিখাঁকে দেখিলে আমাদেরই হাড় জ্বলিয়া যায়—তা মেহের ত কোমলপ্রাণা রমণী! আমার বোধ হয়—তাহার পিতার প্রশ্রয় পাইয়া সেই গোঁয়ারটা গিয়াসবেগের বাটীতে যাতায়াত করিতেছে।

সেলিম। করুক। কিন্তু জানিও মির্জ্জা মহম্মদ! সুলতান সেলিমের স্বার্থের পথে যে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার জীবনই বিনষ্ট হইবে।

এই সময়ে নহবৎ-খানা হইতে দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হইল। দ্বিপ্রহরের নহবৎ আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া, সেলিম বলিলেন—"মির্জ্জা! এত রাত হইয়া গিয়াছে!"

মির্জ্জা-সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটী ছোট খাট কুর্ণীস করিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সেই দীপাবলী উজ্জ্বলিত, রত্নখচিত, মখমলমণ্ডিত, গোলাববাসিত, পুষ্পরাগলাঞ্ছিত জ্যোতির্ম্ময় কক্ষতলে একা দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানের যুবরাজ সাহ সেলিম।

এমন সময়ে এক স্ত্রীলোক ধীরগতিতে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুর্ণীশ করিয়া বলিল—"জাঁহাপনা! খোদা আপনার মঙ্গল করুন।"

সেলিম তাহাকে দেখিয়া যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিলেন—"জুলিয়া! আমার একটী উপকার করিবে।"

জুলিয়া। আমি জনাবের বাঁদী! হুকুমের দাসী!

সেলিম। এই পত্রখানি অতি গোপনে গিয়াসবেগের বাড়ীতে দিয়া আসিতে হইবে।

জুলিয়া। এখনিই!

সেলিম। পারিলে ভাল হয়! আমি তোমার সঙ্গে বলবান খোজা দিতেছি।

জুলিয়া। এতরাত্রে তাহারা কি জাগিয়া আছে!

সেলিম্। আচ্ছা কাল রাত্রে যাইও। প্রথম প্রহরের পর আমার নিকট হইতে এই পত্র লইয়া যাইবে। দিবাভাগে যাওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না।

জুলিয়া। তাহাই করিব। জনাব যাহাতে খুসী হন, তাহাই আমার ইচ্ছা! আর কিছু ফরমায়েস্ আছে?

সেলিম। না—আমি বড় ক্লান্ত! কাল সায়াহ্নে একবার আসিও।

জুলিয়া কুর্ণীস করিয়া হাস্যমুখে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। জুলিয়ার রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠপ্রান্তেলীন সেই হাস্যের মর্ম্ম সেই জানিত।

ক্রমশঃ

গিরিশ-প্রসঙ্গ।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

নাট্যজগতের গর্ব্বের সামগ্রী নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র ইহজগতে আর নাই। চিরদিন কেহ এ সংসারে থাকেন না তিনিও থাকিবেন না; তাহা জানি। তথাপি সাহিত্যানুরাগী বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার বিরহে সকলেই আজ শোকাচ্ছন্ন। কারণ আরও কিছুকাল তাঁহার জীবিত থাকা অসম্ভব ব্যাপার নহে। নিয়তি দেবী সুপ্রসন্না হইলে, নিষ্ঠুর করালগ্রাসী কাল ইচ্ছা করিলে আরও কিছুকাল তিনিতো থাকিতে পারিতেন, কিন্তু বিধিলিপি বড় কঠিন সামগ্রী! খণ্ডন করিবার সাধ্য কাহার? তাই গিরিশচন্দ্র—শুধু গিরিশচন্দ্র বলি কেন—বঙ্গের মুখোজ্জলকারী অনেক সুসন্তান অসময়ে বঙ্গমাতাকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন। সংসারে যেমনটি যায় তেমনটি আর আসে না। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু, মাইকেল, রমেশচন্দ্র, প্রভৃতি একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মতন আর হইবে কি—আর পাইব কি? না—কিছুতেই আর তেমনটী মিলিবে না। গিরিশচন্দ্র গেলেন—আর সে স্থান পূর্ণ করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি হইবে কি? অসম্ভব।

বঙ্গসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের স্থান কোথায়, এখনও তাহা নির্ণয় করিবার দিন আসে নাই। কয় দিন মাত্র তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন—এখনও যেন সম্যক উপলব্ধি হইতেছে না—যে তিনি নাই। আরও কিছুদিন যাক্ বঙ্গবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর সাধারণ সকলেই ভাল করিয়া বুঝুন যে গিরিশচন্দ্র সত্য সত্যই আর আমাদের ভিতর নাই—তখন তাঁহার খোঁজ পড়িবে। তখন তাঁহাকে চিনিবার জন্য লোকে ব্যগ্র হইবে। তখন সকলেই প্রাণে

প্রাণে বুঝিতে পারিবেন—জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেখিতে পাইবেন-কোথায় কতদূরে কত উচ্চে গিরিশচন্দ্রের আসন। জীবদ্দশায় যাঁহারা বলিতেন ঐ ওপাড়ার থিয়েটারওয়ালা গিরিশ ঘোষ—তাঁহারাই যদি ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচিয়া থাকেন—তাঁহারাই বলিবেন—বলিয়া গর্ব্ব করিবেন—"আমাদের গিরিশচন্দ্র!" তাই বলিতেছি—এখনও ঠিক সময় হয় নাই। গিরিশচন্দ্র যথার্থই কর্ম্মবীর ছিলেন—তিনি কর্ম্ম করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। নামের জন্য—নাম বাজাইবার জন্য—বিজ্ঞাপনের দ্বারা নাম কিনিবার জন্য লালায়িত ছিলেন না। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেই আসিয়াছিলেন—কর্ম্ম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন;—ভগবদ্বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। নিন্দা সুখ্যাতি সুনাম কুনাম যশমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। "বিষ্ঠাচন্দনে" যাঁর সমভাব, তিনিই তো মহাপুরুষ। গিরিশচন্দ্রকে কি বলিব? তিনি যদি আত্মসম্মান লাভের জন্য উদ্যোগী হইতেন—জীবদ্দশায় যদি একটা দল পাকাইয়া ভিতরে ভিতরে একটা আত্ম সম্বর্দ্ধনার "দানসাগরের" ব্যবস্থার জন্য "এর ওর তার" দ্বারে দ্বারে গিয়া দু দশটা "সর্ব্বদেবপ্রিয়" স্তুতিবাদ আওড়াইতে পারিতেন—তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরাট নামের সজীব মূর্ত্তি দেখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তো করেন নাই। "চৈতন্যলীলা"—"বিল্বমঙ্গল"—"বুদ্ধদেব"—"শঙ্করাচার্য্য" প্রভৃতি রাশি রাশি অমৃতময় গ্রন্থাবলী লিখিয়া চক্ষু বুজিয়া ছাড়িয়া দিতেন—অসংখ্য আদর্শ চরিত্ররাজি সৃজন করিয়া বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে অবিচলিতচিত্তে সকলের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া আপনার ভাবে আপনিই বিভোর হইয়া থাকিতেন! গুণগ্রাহী ষট্‌পদগণ আপনারা উপযাচক হইয়া তাহা হইতে মধু আহরণ করিয়া অমৃত আস্বাদন করিয়া স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সমস্বরে একবাক্যে "জয় গিরিশচন্দ্রের জয়" বলিয়া তাঁহার

যশোগান করিতেন! আর অন্নাভিলাষী মক্ষিকাকুলের যাহা কর্ত্তব্য, যাহা করিবার জন্য তাঁহারা বিধিনিয়োজিত, তাঁহারা কি করিতেন বা এখনও করিতেছেন—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র!

গিরিশচন্দ্রকে হারাইয়া গুণগ্রাহী হৃদয়বান বঙ্গবাসী মাত্রেই তো কাঁদিল দেখিতে পাই। "বসুমতী" "বঙ্গবাসী" "হিতবাদী" "নায়ক" প্রভৃতি "বাঙ্গালী মাত্রেই" তো হাহাকারে দশদিক পূর্ণ করিলেন! কেবল কাঁদিলেন না কাহারা? যাঁহারা পরের ভাল দেখিতে পারেন না, যাঁহারা পরের হিংসায় জীবন অতিবাহিত করেন। যাঁহারা যুথভ্রষ্ট মেষশাবকের ন্যায় বাঙ্গালীর দলছাড়া হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মরিলে (আমরা যদি বাঁচিয়া থাকি) আমাদের কান্না আসিবেই আসিবে—আমরা খুব কাঁদিব;—না কাঁদিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিব না।

গিরিশচন্দ্র তো চাপকান আঁটিয়া কেরানীগিরি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বেলা নয়টার সময় দুটী নাকে মুখে চোখে গুজিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বোতাম আঁটিতে আঁটিতে আফিস অভিমুখে তো তিনি রওনা হইয়াছিলেন। সমস্ত দিন কলম ঠেলিয়া রাত্রি নয়টার পর বাড়ী আসিয়া আড় হইয়া তো পড়িয়াই ছিলেন! সে জীবন স্রোত ফিরাইয়া এমন ভীষণ কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনী সৃজিত হইল—কাহার ইচ্ছায়? ইচ্ছা গিরিশচন্দ্রের নয়—ইচ্ছা তোমার আমার নয়—এ ইচ্ছা সেই সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময়ের। "বড়" হইতে হইলে—যথার্থ "বড়" লোক হইতে গেলে—মানব জীবনে যাহা প্রয়োজন তাহাতো গিরিশচন্দ্রে সকলই ছিল! অসাধারণ মেধা, ভগবদ্ভক্তি, দূরদর্শিতা, নির্ভিকতা, স্বদেশবাৎসল্য, মিষ্টভাষিতা, পরোপকারেচ্ছা, উদারতা গিরিশচন্দ্রের তিলমাত্র অভাব ছিলনা! তুমি আমি তাঁহাকে চিনিবার জানিবার বুঝিবার বহুকাল—বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহাকে যিনি

চিনিবার—যিনি জানিবার—যিনি বুঝিবার সেই সদা ঈশ্বরাবতার ভগবান রামকৃষ্ণদেব চিনিয়াছিলেন—জানিয়াছিলেন—ভাল রকমই বুঝিয়াছিলেন! পাকা জহুরী কয়লার খনি হইতে ময়লা মাখা হীরক-খণ্ড অতি যত্নে তুলিয়া লইয়া নিজবক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবনেই স্বর্গলাভ হয় নাই কি?

বাঙ্গালায় গিরিশচন্দ্রের মতন কয়জন মেধাবী দেখিতে পাওয়া যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ তো কখনো তিনি মাড়ান নাই—অথচ কয়জন তাঁহার মতন বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন! বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে অনর্গল দুইঘণ্টা কাল ধরিয়া Shakespeare—Milton—Pope—Byron ইত্যাদি হইতে মুখস্থ আওড়াইতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিতাম! ভাবিতাম "মানুষে কি এত পারে?" কখনো যদি বলিতাম—"অমুক ব্যক্তি একখানি গীত রচনা করিয়াছে—কেমন শুনুন দেখি!" শুনিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিতেন—"ইংরাজি বা সংস্কৃতের অমুক গ্রন্থের অমুক স্থানে এইরূপ একটা আছে" বলিয়াই দুপাতা আওড়াইয়া দিতেন। সেই গ্রন্থ সঙ্গে সঙ্গে বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিয়াছি—একটী বর্ণও বলিতে ভুল করেন নাই! যথার্থই অসাধারণ ক্ষমতা নয় কি?

তাই বলিতেছিলাম—গিরিশচন্দ্রকে হারাইয়া সাহিত্যজগতের একটা অমূল্যনিধি হারাইলাম—আর তেমনটী কখনো পাইব না! সহযোগী "প্রবাসী" চৈত্রের সংখ্যায় সেই গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া লিখিয়াছেন—"আমরা তাঁহার কোন নাটক পড়ি নাই—বাঙ্গালা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোন থিয়েটারে কখন যাই নাই। এই জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।"

তা-তো বটেই! গিরিশচন্দ্র (অথবা তাঁহার গ্রন্থ) তো আর (ঈশ্বরের ন্যায়) নিরাকার নয় যে সহযোগী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া

তৎসম্বন্ধে আত্মজ্ঞান হইতে ঝাড়া বাহান্ন পৃষ্ঠা তত্ত্বকথা ব্যক্ত করিবেন! সহযোগী সুশিক্ষিত বিদ্বান—মহাপণ্ডিত—সুসভ্য—ঘোর স্বদেশী! ইংরাজী পড়িয়াছেন—ফারসী পড়িয়াছেন—জার্ম্মান গ্রন্থের অনুশীলন করিয়াছেন, কামস্কাট্‌কা প্রদেশে উই-ঢিবির তলায় যে তথাকার প্রাচীন গ্রন্থ দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া লুক্কায়িত ছিল তাহার উদ্ধারসাধন করিয়া—সে গ্রন্থও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন,—পাড়া প্রতিবাসী গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থ স্পর্শ করিলে তাঁহার যে মহাপাতক হইবে! হায় মা বঙ্গভাষা! তোমার অদৃষ্টে এতও ছিল? (ক্রমশঃ)

পতি-নির্ব্বাচন।

রঙ্গগীতি।

[শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিত]

আমার মত ভাগ্যবতী কে আছে ধরায়।
এ জগতে উকিল পতি ক'জন বল পায়॥
যদি পতি আবশ্যকই অতি, তবে ক'রো উকিল দেখে পতি
হলে গুণবতী তার যুবতী সে সোহাগে সাজায়॥
তাঁর তেলে ভেজা সামলা, ঘুঁটে জুটিয়ে আনে মামলা
(আর) গামলা ভরে টাকা এনে নাথ ঢালেন আমার পায়॥
হ'লে কলেজ প্রফেসর, তাঁর বেকন কি চসার,
নোট লিখে মোট হাল্কা ক'রে প'ড়োরে বাঁচায়;
এ দিকে নবর চবর নাইকো খবর (মাগ) কি খেয়ে আঁচায়।
পতি মাষ্টার হন যদি, কষ্টের নাইতো অবধি,
তাঁর ডিউটির ওপর টিউটারি এক কাতেতে রাত পোয়ায়॥
সোয়ামী হ'লে জমীদার তাঁর বেয়াড়া আবদার

বলবে লোকে কিমাশ্চর্য্য তাই ভার্য্যারে সে সাজ পরায়॥

প্রণপতি যদি মহাজন, তাঁর নানান প্রয়োজন,

ক'রে ওজন দরে প্রেমালাপ খতেন করেন হালখাতায়॥

হলেন যদি ডাক্তার, দুপুর রেতে ডাকতাঁর,

তিনি করেন নাইট ডিউটি বিউটি উঠে-বসে রাত কাটায়॥

হলে সলিসিটার মাই ডিয়ার

তিনি একেবারে ঘোর ইয়ার

তাঁর বাগানে থ্রি চিয়ার ওয়াইফ টিয়ার পোঁছে বিছানায়॥

পতি হলে নূতন ডেপুটী, ব'নে যান আস্ত ডেঁপোটী—

কত ভিরকুটী মটন কুটী দুশোটাকার নিত্যি কে যোগায়॥

হ'লে মুন্সেফ কি সবজজ, গোমস্তা মুখে গজর গজ

বাতে পঙ্গু শরীর ভঙ্গ—ডায়বিটিসের নোটীশ গায়।

পতি যদি পাবলিক ম্যান, তাঁর থাকেনা আর কাণ্ডজ্ঞান,

দেশের দুঃখের বেগে অতি বেগে মেগের কাছেই চাঁদা চায়॥

রাজনীতি নিয়ে মগজে, কর্ত্তা যদি লেখেন কাগজে

তাঁর গজে গজে বিদ্যে বাড়ে জজের ওপর লিখেন রায়,—

সে সমালোচনায় জ্বালায় খালি মৃগলোচনায়॥

আহা সে ক্ষুদ্দুর পরাণি,

হালের ভদ্দর কেরানি

তাদের রাণী কয়না বাণী লুকিয়ে কেঁদে চোক ভাসায়—

টাকার কান্না মানের কান্না আবার তার ওপরে কন্যাদায়॥

ভাতার করে থিয়েটার, রেতে দেখা পাওয়া ভার,

আর ভোরে এসে ঘরে শুয়ে ঘুমের ঘোরে কি চেঁচায়,

আস্তে ক'?? নাইকো মুখে প্রেমকরে না ড্রম বাজায়॥

বিলাতি-রঙ্গিণী।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে মিঃ স্মিথ্ মেরিয়াসকে "রয়েল গ্র্যাণ্ড্ সেলুন" হইতে কৌশলে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ঠিক সেই রাত্রে ঘটনাচক্রে "ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে" মিঃ জর্জ্জ ভিল্লিয়ার্সের নাট্যাভিনয়ে কোন ভূমিকা না থাকায় তিনি মেরিয়াসকে সঙ্গে করিয়া গৃহে আনিবার জন্য তাড়াতাড়ী রয়েল গ্র্যাণ্ড্ সেলুন অভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র অধ্যক্ষ মিঃ ডি ক্লিফোর্ডের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং দুই চারি কথা হইবার পরেই মিঃ ভিল্লিয়ার্স তাঁহার প্রমুখাৎ মেরিয়াসের ব্যাপার সমস্ত অবগত হইলেন। শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্স বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! মেরিয়াসকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল? কে এমন কাজ কল্লে? যে নিয়ে গেছে নিশ্চয়ই তার কোন মন্দ অভিসন্ধি আছেই আছে! হায়—হায়! হতভাগিনী কি চিরকাল এই রকমে যন্ত্রনা ভোগ কর্ব্বে?"

মিঃ ক্লিফোর্ড কিছুক্ষণ অবাক হইয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্সের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন—"যিনি মেরিয়াসকে নিয়ে গেছেন তাঁর মন্দ মতলব আছে কিনা বল্‌তে পারিনা! কিন্তু আমাদের দ্বার-রক্ষক যা আমাকে ব'ল্লে, তা যদি সত্য হয় তাহলে আমার বেশ স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে মেরিয়াস নিজেই এই রকম মতলব খাটিয়ে ফাঁকি দিয়ে এখান থেকে সরে পড়েছে।" "মেরিয়াস মতলব করে ফাঁকি দিয়ে

সয়েছে ?” মিঃ ভিল্লিয়াস অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল—“এ আপনি কি বলচেন মশাই ?”

“বল্‌ছি ঠিক্ !” অধ্যক্ষ মহাশয় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। “বলছি ঠিক ! মেরিয়াস যদি গোড়া থেকে এ মতলব না ক’র্ত্ত, তাহলে কি সহরের নামজাদা বদ্‌মায়েস্ দুষ্ট-লম্পটকে নিয়ে এক গাড়ীতে এক সঙ্গে যেতো ?”

“কে—কে ? কার সঙ্গে মেরিয়াস চলে গেল ?” মিঃ ভিল্লিয়াস যেন হতবুদ্ধি হইয়া এই কথাগুলি বলিয়া উঠিলেন। “কার সঙ্গে আবার ? মিঃ স্মিথকে চেনেন না ? সেই পৃথিবী-বিখ্যাত মহাপুরুষ—লম্পটের শিরোমণি ! তার সঙ্গে মেরিয়াস এক গাড়ীতে কি সাহসে গেল তাতো বুঝতে পারিনি !”

“এঁ্যা—বলেন কি ? মিঃ স্মিথের সঙ্গে ? কি সর্ব্বনাশ ! হায় হায়—আর কি মেরিয়াসকে খুঁজে পাওয়া যাবে ?” এই কথা বলিতে বলিতে মিঃ ভিল্লিয়াস্ নিজের হাত মুচ্‌ড়াইতে এবং মাথা চাপ্‌ড়াইতে লাগিলেন।

“না—না—আপনি ভাব্‌ছেন কেন ? মেরিয়াস্‌কে পাওয়া যাবেনা কেন ? মিঃ স্মিথ তার একটা মস্ত হিল্লে করে দেবে এখন। যে কদিন সখ হবে—কাছে রেখে খুব আমোদ আহ্লাদ কর্ব্বে—তার পর সখ্ মিটে গেলে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে বিদায় করে দেবে ! সেই সময় আবার মেরিয়াসের দেখা পাবেন বৈকি ! তা বেশ ! মিঃ স্মিথ বড় লোক—তার পাল্লায় গিয়ে বিবি পড়েছেন—সকল কষ্টই দূর হবে, তাঁর খুব ভালই হবে ! তবে বল্‌ছিলুম কি—আমার সঙ্গে এমন চালাকীটা না ক’রলেই হ’ত ! যাহোক,—তার জন্যে আমার বেশ দুটাকা রোজগার হ’চ্ছিল,—এখন আমার বিশেষ একটু ক্ষতি হ’ল কি না—তাই বল্‌ছি—এরকম করে চলে যাওয়াটা তাঁর ভাল হয়েছে

কি? এই কি ধর্ম্ম? ছি-ছি-ছি! আর তাও বলি—ওদের জাতের কি কোন ধর্ম্মজ্ঞান আছে? স্বার্থ হ'ল ওদের ধর্ম্ম কর্ম্ম—সব! ওরকম চরিত্রের স্ত্রীলোক যারা—তারা কি সদুপায়ে গতর খাটিয়ে—ধর্ম্মপথে থেকে পয়সা রোজগার ভালবাসে? ওদের প্রবৃত্তি যে অন্যরকম! রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হয়—কেবল সাধারণের কাছে নিজেদের রূপের বিজ্ঞাপন কর্ব্বার জন্য! দিনকতক রং ঢং করে একজন দর্শকের মন ভুলিয়ে—ব্যস্—তাকে নিয়ে অমনি সরে পড়লেন—আর রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন আর কি! তবে এটা নিশ্চয়—ও বেটীদের কখনো ভাল হয়না! শেষ দশায় নাকালের একশেষ; হয় ভিক্ষা—নয় আত্মহত্যা—এ দুয়ের মধ্যে একটা হবেই হবে!" এইরূপ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মিঃ ক্লিফোর্ড কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন! বাস্তবিক তাঁহার মুখখানি যেন রক্তমাখা হইয়া উঠিল!

মিঃ ভিল্লিয়ার্স স্থির হইয়া মিঃ ক্লিফোর্ডের কথাগুলি শুনিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আপনি যা বল্লেন কথাগুলি অন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে খুব সত্য বটে! কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি যে মেরিয়াস সে চরিত্রের স্ত্রীলোক নয়! তার সম্বন্ধে এরূপ ধারণ আপনার সম্পূর্ণ ভুল!" "তা হবে—"এই দুটী কথা মাত্র বলিয়া মিঃ ক্লিফোর্ড আর কিছু বলিলেন না! কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কি যেন ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"আপনি যদি নিশ্চয়ই জানেন মেরিয়াস সে প্রকৃতির নয়,—তাকে মিথ্যে ভুলিয়ে হরণ করে নিয়ে গেছে—তাহলে তাকে রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছেন না কেন? অনর্থক সময় নষ্ট ক'রে ফল কি?"

মিঃ ভিল্লিয়ার্স অত্যন্ত অস্থির হইয়া বলিলেন—"আমি কি কর্ব্ব? আমি কি কর্ত্তে পারি?"

"কেন? তাদের পাছু পাছু ধাওয়া করুন না!"

"গাড়ী কোন দিকে গেছে বল্‌তে পারেন?"

"ব্ল্যাক আইভিসের দিকে—ইসেক্‌সে তারা আপাততঃ গেছে। তাদের গাড়ীর কোচম্যান্‌ আমার দ্বাররক্ষককে কথায় কথায় তাদের যাবার নির্দ্দিষ্ট স্থানের কথা বলে গেছে, আমি তাই শুনে বল্‌ছি!"

"তাহলে আমি এখন এত রাত্রে সেখানে কি করে যাই বলুন দিকি! এ সময় তো ট্রেনও পাবনা—ষ্টিমারও পাবনা—তাহলে উপায় কি?"

"একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী করে যান! অনেকটা পথ বটে—কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কি বলুন? এই বেলা শিগ্‌গির শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়ুন—নইলে বেশী দেরী কল্লে হয়তো সন্ধান পাবেন না?" এই কথাগুলি বলিয়া মিঃ ক্লিফোর্ড মিঃ ভিলিয়াসের করমর্দ্দন করিয়া পুনরায় বলিলেন—"প্রার্থনা করি—জগদীশ্বর আপনার কার্য্যে সহায়তা করুন!" দ্বিরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ী মিঃ ভিলিয়ার্স একখানি গাড়ী ভাড়া করিতে গেলেন।

অতি প্রত্যূষে মিঃ ভিলিয়ার্স গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। সমস্তরাত্রি গাড়ীতে বসিয়া তাঁহার অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল; প্রভাত বায়ু স্পর্শে অত্যন্ত শীতবোধ হইলে—কেমন যেন জ্বরভাব মনে হইতে লাগিল। মিঃ ক্লিফোর্ডের কথা মত মিঃ ভিলিয়ার্স বেড়াইতে বেড়াইতে একটী সিগারেট ধরাইয়া ধূমপান করিতে করিতে একটী পুরাতন উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মিঃ ভিলিয়ার্স জনমানবের সাড়া শব্দ পাইলেন না, বাড়ীটি যেন নির্জ্জন পরিত্যক্ত মনে হইল। মিঃ ভিলিয়ার্স উত্তর দিকের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন;—বাস্তবিক সে দিকটায় প্রায় পঞ্চাশ ষাট বৎসর লোকের কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। সুতরাং সে স্থানটা

অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই উদ্যানবাটী মিঃ স্মিথের পৈতৃক সম্পত্তি; ইহার নাম "সাইপ্রেস্ গ্রেভ্স্।"

মিঃ স্মিথের পিতার আমল হইতেই উদ্যানবাটীর উত্তর দিক হইতে সমস্ত জিনিষ আস্‌বাবপত্র উঠাইয়া লইয়া পশ্চিম দিকে রক্ষা করা হইয়াছিল, সুতরাং পশ্চিম দিকেই লোকজনের বসবাস ছিল—এবং উত্তর দিকটা একেবারে পরিত্যক্ত ভাবেই পড়িয়া থাকিত। উদ্যানবাটীর দক্ষিণ দিক আস্তাবলের চাকরদের জন্য ব্যবহৃত হইত। উত্তর দিকের বাহিরের ঘরগুলি দেখিলে বেশ স্পষ্টই মনে হয়—বহুকাল যাবৎ এ দিকে ভ্রমেও কোন মনুষ্য পদার্পণ করে নাই। স্থানে স্থানে জানালাগুলি সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন—চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। ঘরগুলির সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ। মেজে দেয়ালে উঠানে বন্য গাছপালার জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। বন জঙ্গল আবর্জ্জনায় সমস্ত দিকটা যেন সর্ব্বদাই অন্ধকারময় হইয়া থাকিত। মনুষ্যের ন্যায় সূর্য্যের কিরণও বোধ হয় ভয়ে এ দিকে আদৌ প্রবেশ করিত না।

নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে মিঃ ভিলিয়ার্স সেই দিকেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—জনমানবের কোনও চিহ্ন নাই! যতদূর যাইতে লাগিলেন—ততদূর জঙ্গল এবং আবর্জ্জনা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু লক্ষ্য হইল না। এইরূপ কিছুদূর চলিতে চলিতে একটী ঘরের জানালার নিকট আসিয়া কি জানি কি বুঝিয়া তথায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সেই জানালার পানে চাহিয়া দেখিলেন—একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি তাহার ভিতর দিয়া আসিতেছে। জানালা রুদ্ধ ছিল; ধুলা ও কাদায় তাহার গাত্র পরিপূর্ণ; মাকড়সার জালে আগাগোড়া আবৃত। জানালার নীচে ইটপাটকেল বালী সুরকী

ইত্যাদির আবর্জ্জনার একটা ঢিবি হইয়া রহিয়াছে; তাহারই নিকটে একটী বহুকালের পুরাতন লৌহ নির্ম্মিত ভাঙ্গা কেদারা পড়িয়া আছে।

এই স্থানে আসিয়া মিঃ ভল্লিয়ার্সের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে সেই কেদারাখানি উঠাইয়া ঢিবির উপর জানালার নীচে রাখিলেন এবং তাহার উপর সন্তর্পণে নিজে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে জানালার পাখী খুলিয়া ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া খিল খুলিয়া একেবারে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। ঘরটী যেন অন্ধকূপ—বাতাসের লেশমাত্রও নাই। ভিল্লিয়ার্সের দারুণ গ্রীষ্ম বোধ হইতে লাগিল—তিনি নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন; আপাদমস্তক ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল। ঘরের এক কোণে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহাতে আলোর কোনরূপ সুবিধা হইতেছিল না। যাহা হৌক—শেষে ক্ষীণ আলোতে ভিল্লিয়ার্স দেখিলেন—একটী পুরাতন ভগ্ন পালঙ্কের উপর একটী মনুষ্য মূর্ত্তি শায়িত। সাহসে ভর করিয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্স তাহারও নিকট গিয়া দেখিলেন—মনুষ্যমূর্ত্তি অন্য কেহ নহে—স্বয়ং মিঃ স্মিথ। তিনি অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইলেন; নানা-প্রকার পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন না—মিঃ স্মিথ জীবিত কি মৃত! এদিকে তাঁহার শরীরও ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিতে লাগিল—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তথাপি সাহসপূর্ব্বক আলো লইয়া মিঃ স্মিথকে দেখিতে গেলেন। আলোর সাহায্যে মিঃ স্মিথের মুখ দেখিয়া তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; কি সর্ব্বনাশ! খুন—খুন! মিঃ স্মিথকে গলা টিপিয়া কে খুন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে! মিঃ ভিল্লিয়ার্সের

হস্তচ্যুত হইয়া প্রদীপ ভূতলে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল! তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—সুরাপানোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় টলিতে টলিতে দেওয়ালে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মনে প্রাণে দেহে যে যন্ত্রনা হইতেছিল—তাহা অবর্ণনীয়।

কি ভয়ানক ব্যাপার! সেই অন্ধকূপ গৃহে তিনি একজন হত ব্যক্তির মৃতদেহ লইয়া একাকী রহিয়াছেন! ভয়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল—পিপাসায় ছাতি ফাটিতে লাগিল! ভিলিয়ার্স ভাবিলেন—"তবে কি মেরিয়াস মিঃ স্মিথকে হত্যা করিয়া পালিয়েছে?" আবার তৎক্ষণাৎ মনে হইল—"যদি কেউ আমাকে এ অবস্থায় এখানে দেখতে পায় তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে হত্যাকারী মনে কর্ব্বে!"

আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া মিঃ ভিলিয়ার্স যে পথ দিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

নাট্য-প্রসঙ্গ।

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ 'মিনার্ভা' থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

* * * * *

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের বিয়োগে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গের নানা স্থানে শোক সভায় অধিবেশন হইতেছে। এই সকল সভা সমিতির অনুষ্ঠাতা ও উদ্যোগীগণ যে নাট্যানুরাগী সহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র—এ কথা বলাই বাহুল্য। উল্লিখিত অসংখ্য সভাসমিতির বিবরণ প্রকাশ ক্ষুদ্রকায় নাট্যমন্দিরের পক্ষে সম্ভবপর নহে; আশা করি, সংবাদদাতৃগণ অবস্থা বুঝিয়া আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

* * * * *

গত ১৭ই চৈত্র শনিবার "ষ্টার" থিয়েটারে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর নূতন সামাজিক নাট্যলীলা "খাস-দখল" প্রথম অভিনীত হইয়াছে। নূতন নাটিকায় অমৃত বাবু স্বয়ং 'নিতাই'য়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কোহিনূর' থিয়েটারেও ঐ রাত্রে শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ মিত্রের "মোহিনী মায়া" নামে একখানি নূতন গীতিনাট্যের প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছে। 'মিনার্ভা' থিয়েটারে 'দরিয়া' নামে একখানি নূতন নাটিকার মহলা চলিতেছে। বারান্তরে এই তিনখানি নাটিকার কথা নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত হইবে।

* * * * *

সুকবি ও সুলেখক শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্ব্বজন-বিদিত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক "উপেক্ষিতার" দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। "উপেক্ষিতা" রচনা করিয়া

ভূপেন বাবু সাহিত্যসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ভূপেন বাবুর উপেক্ষিতা সর্ব্বত্র সমাদৃত ও নানা স্থানে অভিনীত হইয়াছে। উপেক্ষিতার নূতন সংস্করণে কয়েকখানি চিত্তরঞ্জন চিত্রও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় ভূপেন্দ্রবাবু পৌরাণিক চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। ভূপেনবাবু আর একখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছেন। "ষ্টার" থিয়েটারে অভিনীত হইবে। পৌরাণিক নাটক রচনায় ভূপেন্দ্রনাথের প্রতিভা অক্ষয় হউক—ইহাই আমাদের কামনা।

* * * * *

আমাদের নাট্যানন্দ লিখিয়াছেন,—"এই নূতন নাট্যাভিনয়ের মরশুমে 'গ্রাণ্ড ন্যাশন্যাল থিয়েটার' একটি বেশ নূতন চাল চালিয়াছেন! গত ১৭ই চৈত্রের জন্য উক্ত থিয়েটারের প্ল্যাকার্ড ও হ্যাণ্ডবিলে ঘোষিত হইয়াছে,—"স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়ের নূতন ঐতিহাসিক নাটক"বনবীর"! প্রথম অভিনয় রজনী!!"—বিজ্ঞাপন ঘোষণাটি বিচিত্র নহে কি? আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, রাজকৃষ্ণ বাবু বুঝি স্বর্গ হইতে "বনবীর" নামে একখানি নূতন ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া 'গ্রাণ্ড ন্যাশান্যাল' থিয়েটারে অভিনয়ার্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই জন্য আমরা কৌতূহল পরবশ হইয়া গ্রাণ্ড ন্যাশান্যালে "স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বাবুর নূতন নাটকের প্রথম অভিনয়" দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্ত দেখিয়াই চক্ষুস্থির! দেখিলাম—রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলীতে যে 'বনবীর' গাঁথা আছে, কলিকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ে—মফস্বলের সখের থিয়েটারগুলিতেও কত শত বার যে 'বনবীর' দর্শন দিয়াছেন—ইনি তিনিই! কেবল গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রদত্ত "নূতন" বিশেষণে ভূষিত হইয়া উক্ত থিয়েটারে আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র!—আমরা সেদিন 'গ্রাণ্ড ন্যাশানাল থিয়েটারের

কর্ত্তৃপক্ষগণের দায়িত্বজ্ঞানের এরূপ অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি! সত্যের অপলাপ না করিয়া মহাসমারোহে পুনরভিনয় রজনী এইরূপ বিজ্ঞাপন বাহির করিলে কি দোষনীয় হইত? সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব এই থিয়েটারের অধ্যক্ষ; জিজ্ঞাসা করি—তাঁহার জ্ঞাতসারে কি এইরূপ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল?"

* * * * *

বঙ্গের নানা স্থানে, এমন কি প্রবাসী-বাঙ্গালী-বহুল ভারতেরও বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবিশ্রুতকীর্ত্তি গিরিশচন্দ্রের বিয়োগজনিত শোক সভার অধিবেশন হইতেছে। কিন্তু মহানগরী কলিকাতায় এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনও অনুষ্ঠানই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার রঙ্গালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণও এ সম্বন্ধে কোনও উদ্যোগ আয়োজন করেন নাই,—তাহার কারণ, তাঁহারা অবগত হন যে, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, সকল সদনুষ্ঠানের অগ্রণী মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় এই অনুষ্ঠানকল্পে স্বয়ং ব্রতী হইয়া কলিকাতা টাউনহলে মহাসমারোহে এক বিরাট সভাধিবেশনের কল্পনা করিয়াছেন। সেই জন্যই কলিকাতা রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও নাট্যানুরাগী সুধীবৃন্দ সারদা বাবুর মুখ চাহিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলেন। আমরাও আভাস পাইয়াছিলাম যে, ভগিনী নিবেদিতার শোক-সভার অধিবেশনের পর গিরিশচন্দ্রের শোক-সভার অধিবেশন হইবে। সেদিন টাউনহলে পবিত্রা নিবেদিতার শোকসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আশা করি, মাননীয় সারদা বাবু এবার গিরিশচন্দ্রের শোক সভাধিবেশনে অবহিত হইবেন। সারদা বাবু গিরিশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ, সারদা বাবু সদনুষ্ঠানে চিরব্রতী, সুতরাং তাঁহার উদ্যোগে শীঘ্রই যে কলিকাতা টাউনহলে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ

এক মহা অধিবেশন হইবে—সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা এরূপ আশা ও ভরসা করিতেছি। এ বিষয়ে আমরা বঙ্গের বিদ্যোৎসাহী সম্ভ্রান্ত সুধীবৃন্দ ও সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে টাউনহলে জীবিত কবি রবীন্দ্রনাথের সম্মান রক্ষার্থ সভাধিবেশন হইয়াছে, সেখানে যদি বঙ্গবিশ্রুতকীর্ত্তি বঙ্গের 'সেক্সপীয়র' ও 'গ্যারিক' স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের শোকসভার অধিবেশন না হয়—লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসী যদি সে মহাসভায় সমবেত হইবার সুযোগ ও সুবিধা না পায়, তাহা হইলে শুধু নাট্যশালার পরিচালকগণ নহে—বাঙ্গালার নেতৃবর্গকেও কলঙ্কভাজন হইতে হইবে,—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাঁহারা দেশের নেতৃপদবাচ্য, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে শুধু রাজনীতিক আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ নহে— এ কথা বলাই বাহুল্য।

* * * * *

"নাট্যমন্দিরের" পাঠক! আপনারা কখনও 'নির্ব্বাক অভিনয়' দেখিয়াছেন কি? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ 'করিন্থিয়ান থিয়েটারে' উচ্চশিক্ষিত বিলাতফেরৎ বাঙ্গালী বাবুরা তাঁহাদের সুশিক্ষিতা সহধর্ম্মিণীদের লইয়া এই 'নির্ব্বাক অভিনয়' দেখাইয়া বিলক্ষণ নাম কিনিয়াছিলেন। এই নির্ব্বাক অভিনয় অনেকটা আমাদের থিয়েটারের অভিনয়েরই অনুরূপ। ইহাতে সাজসজ্জার ঢং-ঢাং ভাব-ভঙ্গী, চলা-ফেরা, পতনিকা-যবনিকা, দৃশ্য-পোষক, এবং হাসি-কান্না ভয়-ক্রোধ প্রভৃতি যসোপাদার—সবই আছে; নাই কেবল—শ্রীমুখের উক্তিটুকু! অভিনেতা অভিনেত্রীগণ রঙ্গমঞ্চে আসেন—যান, বসেন—দাঁড়ান, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু কথা নাই, সকলেই নির্ব্বাক,— মুখে যাহা বলিবার, তাহা ইঙ্গিত-ইসারাতেই সারিয়া চলিয়া যান! সেইজন্যই এই অভিনয় এদেশে নির্ব্বাক অভিনয় নামে পরিচিত। আর পাশ্চাত্য জগতে ইহা 'টেব্লো' নামে

অভিহিত। যখন করিন্থিয়ান থিয়েটারে এদেশের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা এই অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন একটা খুব হৈ চৈ পড়িয়াছিল! সংপ্রতি সংবাদ পত্রে প্রকাশ,—বিলাত প্রবাসী ভারতীয় সম্ভ্রান্ত যুবক ও যুবতীগণ লণ্ডনের "কোর্ট" থিয়েটারে এই নির্ব্বাক অভিনয়ের আয়োজন অনুষ্ঠান করিতেছেন। শীঘ্রই অভিনয় হইবে; অভিনেয় নাটক—মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব।' অভিনয় দেখিবেন—বিলাতের সাহেব বিবি ও বিবিধ দেশের বিবিধ প্রাণী! দর্শকগণের নিকট বাহোবা মিলিবে নিশ্চিতই!—আমাদের গোলদিঘির সখি কে বলেন? কথায় বলে,—'ব্যাং যায়—ব্যাং যায়—খোল্‌সে বলে, আমিও যাই।' ইহাও যে তাই! নটব্যবসায়ীগণের দেখাদেখি উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক যুবতীরাও যে রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইতেছেন! ঢং ঢাং ভাব ভঙ্গী সবই আছে, নাই কেবল কথা! ও সঙ্কোচটুকু আর থাকে কেন? নাচিতে নামিয়া ঘোমটা টানা বিড়ম্বনা! আমাদের অনুরোধ—গোলদিঘির সখি 'গোলাপপানি' মাথায় দিয়া কোমর বাঁধিয়া এবার উঠিয়া পড়ুন, তাঁহার তুবড়ি মুখে ফিনকি দিয়া আগুন ছুটুক,—তাহার ফলে তথাকথিত সঙ্কোচের বাঁধ—ওই কথা-রূপ ঘোমটাটুকু অপসৃত হোক! আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি! 'নির্ব্বাক-অভিনয়' সবাক-অভিনয়ে পরিণত হোক—কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্য সহযোগী পাইয়া আমরা কৃত-কৃতার্থ হই।

সম্পাদকের নিবেদন।

নাট্য-মন্দিরের সহৃদয় গ্রাহকবর্গ,—গত মাসের 'নাট্য-মন্দিরে' আমার এক নিবেদন পত্র বাহির হইয়াছিল। আমার নিবেদন যে আমাদের সহৃদয় গ্রাহকমণ্ডলীর মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে,—তাহা তাঁহাদের প্রেরিত সহানুভূতিপূর্ণ পত্রে সম্যকরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহাদের এই অনুগ্রহ-পত্র নাট্য-মন্দিরের কার্য্যে আমাকে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত করিয়াছে। যাঁহারা আফিসে আসিয়া অথবা মনি অর্ডার করিয়া অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া আমার এই অনুষ্ঠানকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা জানি না; তবে এইটুকু বলিতে পারি, নাট্য-মন্দিরের হিতচিকীর্ষু গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আমি যে বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা পূর্ণ হইবে এবং এই আবশ্যক সময়ে সাহায্যকারী গ্রাহকবৃন্দের নাম ও সহৃদয়তার পরিচয় নাট্যমন্দিরের সহিত উজ্জ্বল অক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে। যাঁহারা এ সময় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, আগামী সংখ্যায় নাট্যমন্দিরে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত করিব। আমি আশা করি, নাট্যমন্দিরের অবশিষ্ট গ্রাহকগণ—যাঁহারা আমার প্রতি এ পর্য্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশে বিরত আছেন,—এই নিবেদন পত্র তাঁহাদেরও মর্ম্মস্পর্শ করিবে, এবং তাঁহারা অবিলম্বে সহানুভূতি পত্র সহ বার্ষিক দর্শনী পাঠাইয়া অথবা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের সংখ্যা ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইবার উপদেশ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, বৈশাখের সংখ্যাই নাট্যমন্দিরের নিজস্ব নবপ্রতিষ্ঠিত প্রেস হইতে বাহির করিব। কিন্তু এবার এ সংখ্যা নিজেদের প্রেস হইতে বাহির করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। কারণ, বাঙ্গালা টাইপ তৈয়ারী অবস্থায় কিনিতে পাওয়া যায় না। অর্ডার দিবার পর অন্ততঃ এক মাসের পূর্ব্বে সমস্ত টাইপ পত্র বুঝিয়া পাওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ নূতন প্রেস করিতে হইলে নানা প্রকারের সাজ সরঞ্জাম এত আবশ্যক হয় যে, সে সব সংগ্রহ করা দু পাঁচ দিনের কার্য্য নহে। যাহা হউক আমরা সত্বর কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতেছি, কারিকর নিযুক্ত করিয়া নিজেরাও অনেক জিনিষপত্র তৈয়ারী করাইয়া

লইতেছি। আর দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রেসের কার্য্য একরূপ সম্পন্ন হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি এবং আগামী জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা আমাদের প্রেস্ হইতে বাহির হইতে পারে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতেছি।

এই সমস্ত কারণে আমরা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের সংখ্যা এক সঙ্গে আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত "রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস" হইতে বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। ১৫ই আষাঢ়ের পূর্ব্বে এই যুগ্ম-সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইবে গ্রাহকগণের নিকট আমি বিনীতভাবে আর একটি কথা নিবেদন করিতেছি;—যাঁহারা আমার নিকট এখনও অগ্রিম বার্ষিক মূল্য অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইতে বিরত আছেন, তাঁহাদের নিকট জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের সংখ্যা ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইব। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে স্থানীয় পোষ্ট আফিসের দুরত্ব জনিত অসুবিধা নিবন্ধনই অনেকেই অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে পারেন নাই। কারণ, অনেকেই আমাকে পত্রযোগে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া নাট্য-মন্দিরের আগামী সংখ্যা ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সেই জন্যই আমি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের যুগ্ম সংখ্যা গ্রাহকবর্গের নিকট (যাঁহারা আগামী বর্ষের জন্য এখনও মূল্য দেন নাই) পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছি। আশা করি, এ সময় তাঁহারা প্রসন্নমনে ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিবেন। আর একথাও জানাইতেছি যে, যদি আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই আমাকে সংবাদ দেন, নতুবা আমাকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তবে আমার আশা আছে, এ সময় নাট্যমন্দিরের গ্রাহক মাত্রেরই আমার প্রস্তাবে সম্মত তো হইবেনই, তদ্ভিন্ন তাঁহারা বন্ধুবান্ধব গণকে নাট্যমন্দিরের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়া আমাকে দৃঢ় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন। আগামী বর্ষের জন্য নাট্যমন্দিরের যে বিরাট উপহারের আয়োজন করা হইতেছে, তাহার তালিকা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইবে। বলা বাহুল্য নাম মাত্র মূল্য লইয়া এই উপহার আপনাদিগকে বিতরণ করা হইবে। নিবেদন ইতি—

আপনাদের চিরানুগৃহীত

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত—সম্পাদক।

নাট্য-মন্দির।

[বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।]

দ্বিতীয় বর্ষ, } বৈশাখ, ১৩১৯। { ১০ম সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

Printed by J. N. Bose, Wilkins Press, College Square,
Edited & Published by A. N. Dutt,
139, Cornwallis St., Calcutta.

ম্যাকবেথের ভূমিকায়
বিলাতের মহাসম্ভ্রান্তবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা
স্যার হারবার্ট ট্রী ।

নাট্য মন্দির।

[বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।]

দ্বিতীয় বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩১৯। { ১০ম সংখ্যা

অভিনেত্রীর রূপ।

(উপন্যাস)

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যামিনীভূষণের বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে! বাড়ীর কর্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দাসী বাঁদীটি পর্য্যন্ত চীৎকার করিয়া কান্না সুরু করিয়াছে। পুরুষ হইলেও তাই,—যামিনীভূষণের চক্ষুদিয়া অশ্রু ঝরিতেছে,—দেখাদেখি চাকরবাকর গুলাও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া নেত্রদ্বয় আরক্ত করিয়াছে। প্রভাত সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সজনীর গ্রেপ্তারের খবর চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যামিনী-ভূষণ নিতাই বাবুকে সঙ্গে লইয়া জামিনের জন্য থানায় গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই! ইন্‌স্পেক্টার স্পষ্টই বলিয়াছেন, হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি নিজের দায়ীত্বে জামিনে খালাস দিতে পারেন না; বিশেষতঃ তদন্ত তখনও শেষ হইয়া উঠে নাই।

সজনীর মাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, ব্রকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিলে কেন? ছেলেটাকে িনে খালাস করিয়া আনিবারও তোমার মুরোদ নাই? সংসারে কায় কি না হয়! বোধহয় কিছু টাকা খরচ হইবে বলিয়া গর্ভের ন্তানকে হাজতে পচাইয়া মারিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না।" যামিনীভূষণ কোন উত্তর করিলেন না; সহধর্ম্মিনীর ক্রোধ-প্রজ্জলিত মুখের দিকে াহিয়া চাহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সজনীর মাতা ারও জ্বলিয়া উঠিলেন, স্বর সপ্তমে চড়াইয়া কহিলেন "অমন ঢং রিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়া—আমরা সব বুঝি। ছেলের উপর তোমার যেরূপ দরদ্—তাহা আর আমার জানিতে বাকী নাই। আমার শেষ কথা,—যদ্যপি সজনীকে আজ বৈকালের মধ্যে বাড়ীতে লইয়া আসিতে না পার, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব—মরিব—মরিব।" যামিনীভূষণ আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার ধৈর্য্যের মাত্রা—সীমা ছাড়াইয়া উঠিল; তিনি ধীর—গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "এ দুঃখের সময় আর তোমার বাক্যবাণ সহ্য হয় না, ছেলেটাকে আদর দিয়া—তাহার আস্কারা বাড়াইয়া—তাহাকে উৎসন্ন দিলে,—তাহার ফলভোগ করিতে হইবে না?" সজনীর মাতা এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভীষণ ঝঙ্কারে গৃহভিত্তি প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্তর দিলেন, "বয়েসকালে কে কবে সাধু সন্ন্যাসী হইয়া থাকে—তাহা জানি না। নিজের বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, ও বয়সে তুমি কি ছিলে? হায়—হায় আমার মুখ চাহিবার কেহই নাই, পোড়া যম কি আমায় ভুলিয়া আছে? এইদণ্ডে আমার মরণ হইল না কেন?" এইবার সজনীর মাতা ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া তাঁহার স্বর্গগত পিতার উদ্দেশে অনেকদুঃখ জানাইলেন। যামিনীভূষণ আর কোনও কথা না কহিয়া—ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে বহির্ব্বাটীতে নামিয়া আসিলেন।

তখন দশটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী ছিল। তাড়াতাড়ি গাড়ি জুতাইয়া পুলিশ আদালতে উপস্থিত হইলেন। নিতাই বাবুকে ইতি-পূর্ব্বেই পাঁচহাজার টাকার চেক কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি পুলিশকোর্টের সমস্ত নামজাদা উকিল ও হাইকোর্টের দুইজন খ্যাতনামা কৌন্সুলি—সজনীর পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। পুলিশ আদালত আজ সরগরম! যথাসময়ে মোকদ্দমা উঠিল। ইন্‌স্পেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন, "অদ্য প্রাতে হাঁসপাতাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সে স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। 'চার্জ্জসিট্' পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; সুতরাং অদ্যকার মত মোকদ্দমা মুলতুবি হউক"। আসামী পক্ষের উকিল কৌন্সুলিগণ ইহাতে আপত্তি করিলেন না, তবে জামিনের প্রার্থনা করা হইল। অনেক তর্ক বিতর্ক, অনেক বাদানুবাদের পর পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিনে সজনীকে আপাততঃ মুক্তি দিবার আদেশ প্রদত্ত হইল।

গাড়িতে উঠিয়াই সজনী নিতাইবাবু ও যামিনীভূষণের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমায় রক্ষা করুন। আর আমি বাড়ী হইতে একপা বাহির হইব না।" যামিনীভূষণ নীরব। নিতাইবাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "তুমি অত কাতর হইতেছ কেন হে? তোমার বাপ কলিকাতাসহরের একজন গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি,—তুমি তাঁহার একমাত্র সন্তান। একটা দোষ করিয়া ফেলিয়াছ বলিয়া তাহার কি মার্জ্জনা নাই?"

হায়রে অর্থ! ধন্য তোমার মোহিনীশক্তি! তুমি যাহার লোহার সিন্দুকের ভিতর থাক, সে অন্য কাহাকেও তোমার প্রসাদ বিতরণ করুক—আর নাই করুক, তথাপি তোমার অস্তিত্বের গুণে—তাহার প্রিয়জনবর্গের সহস্র অমার্জ্জনীয় অপরাধ সমাজের চক্ষে গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতঃপর নিতাইবাবু যামিনীভূষণকে উদ্দেশ করিয়া

বলিলেন, "আজ তিনহাজার টাকার উপর খরচ হইয়া গিয়াছে। যেরূপ বুঝিলাম, মোকদ্দমা এখন অনেক দিন চলিবে। চূড়ান্ত নিস্পত্তি পুলিশ আদালতে হইতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ এ মোকদ্দমা সেসনে 'কমিট্' করিতে বাধ্য। তুমি চিন্তা করিও না, আমাদের যতদূর সাধ্য আমরা করিব। তবে—কিছু খরচ করিতে হইবে।"

যামিনীভূষণ বলিলেন "মোটের উপর কতটাকা খরচ হইবে বোধ হয় ?"

নিতাই বাবু। পুলিশকোর্টে মোকদ্দমা আট দশদিন চলিবে। প্রত্যেকদিন অন্ততঃ তিনহাজার টাকা করিয়া ব্যয় হইবে, তার পর সেসন কোর্টে পাঁচ ছয় দিনের কম যে চূড়ান্ত নিস্পত্তি হয়—আমার এরূপ মনে হয় না। যদি সজনীকে বাঁচাইতে হয়, তবে হাইকোর্টের অধিকাংশ নামজাদা ব্যারিষ্টারগুলিকে 'এন্‌গেজ' করিতে হইবে। তথাকার দৈনিক খরচা দশ হাজার টাকার ন্যূন হইবেক না। ইহার জন্য তোমায় প্রস্তুত হইতে হইবে।

যামিনীভূষণ হিসাব করিয়া খতাইয়া দেখিলেন, সজনীকে বাঁচাইতে হইলে তাঁহাকে একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। কিন্তু উপায় নাই। যদি সমাজ মানিয়া চলিতে হয়, তবে অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া সজনীকে রক্ষা করিতে হইবে। আবার যদি সংসারে থাকিতে হয়, গৃহেরসুখ ও শান্তি বজায় রাখিবার জন্য সজনীর উদ্ধার কল্পে শেষ কানাকড়িটী পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে হইবে।

যামিনী ভূষণের মনে হইল, এ রূপ হতভাগ্য সন্তানের সূতিকাগৃহে মৃত্যু হয় নাই কেন ?

এইবার নিতাই বাবুর আপিসের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। তিনি যাইবার সময় যামিনীভূষণকে বলিয়া গেলেন, "আজকের মধ্যে বিশহাজার টাকার একখানা চেক আমাকে পাঠাইয়া দিও। আর

কাল বেলা দশটার মধ্যে সজনাকে লইয়া পুলিশকোর্টে উপস্থিত হইও।"

যামিনীভূষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, পাঁচ হাজার ফোঁটা দেহের রক্ত আজ প্রাতে দিয়াছি, রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই আবার বিশ হাজার ফোঁটা দিতে হইবে। আরও কত দিতে হইবে কে জানে? এ ভগ্ন শরীরে কত শোণিত আছে—কত যোগাইতে পারিব!

অতঃপর দশ বারো দিন ধরিয়া পুলিশ কোর্টে মোকদ্দমা চলিল। শেষ দিন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সজনীকে সেসন্ সোপরদ্দ করিলেন। কৌন্সুলি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, বিলম্ব না করিয়া উচ্চ আদালত হইতে সজনীর জামিনের হুকুম লইয়া আসিল।

এইবার সেসন্ কোর্টে মামলা আরম্ভ হইল। প্রায় সমস্ত বড় বড় কৌন্সুলি সজনীর পক্ষে! প্রকৃত অর্থের শ্রাদ্ধ যাহাকে বলে, তাহাই হইল। এক একটা সাক্ষীর একদিন দুইদিন ধরিয়া জেরা চলিতে লাগিল। প্রধান প্রধান দু'একজন সাক্ষীর জবানবন্দি একটু এদিক ওদিক হইয়া গেল। পরিশেষে জুরীরা সজনীকে "Benefit of the duobt" দিবার জন্য জজ সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। জজ সাহেব জুরীগণের সহিত একমত হইয়া সজনীকে অব্যাহতি দিলেন।

সজনীকে লইয়া যামিনীভূষণ বাটীতে উপস্থিত হইয়া এক প্রকার বিকৃত হাস্যের সহিত বলিলেন "যাও—তোমার মার সহিত দেখা কর। তাঁহাকে বলিও আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি, কিন্তু আমি সর্ব্বস্বান্ত; বসৎবাড়ী, ভাড়াটিয়া বাড়ী, সখের বাগান, সমস্তই বাঁধা পড়িয়াছে। রোজগার করিবার সামর্থ আর আমার নাই; সুতরাং ঋণ পরিশোধের উপায়ও আর নাই। খোলার ঘরে বাস করিবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বল"।

সজনী মাসাবধি প্রতিমুহূর্তে চক্ষের উপর ফাঁসিকাষ্ঠের বীভৎস দৃশ্য দর্শন করিতেছিল, ভাল করিয়া খায় নাই, হাসে নাই, ঘুমায় নাই। সে যে আবার স্বাধীন বায়ু সেবন করিবে, মুক্ত আকাশ তলে অবাধে বিচরণ করিবে, এ আশা তাহার ছিলনা। সে যে মুক্তি পাইয়াছে এই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। যামিনীভূষণের কি হইল না হইল, ভবিষ্যতে তাঁহাকে খোলার ঘরে বাস করিতে হইবে কি না, এ সকল চিন্তা করিবার সময় এখনও তাহার উপস্থিত হয় নাই। সে তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল।

যামিনীভূষণ আপনার বৈঠকখানায় গিয়া অবসাদগ্রস্ত দেহভার লইয়া চিন্তার তরঙ্গে আলোড়িত হইতে হইতে শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথার ভিতর—কে যেন লোহার হাতুড়ী জোরে জোরে আঘাত করিতে লাগিল। মস্তিকের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হইয়া টগ্ বগ্ করিয়া ঘৃতের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। যায়—যায়—মাথার খুলিটা বুঝি ফাটিয়া যায়! যামিনীভূষণ উঠিয়া বসিলেন। অনন্ত নিদ্রায় তাঁহার দুই চক্ষু যেন আবরিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার কই! তাঁহার চক্ষের উপর দিয়া চিত্রপটের ন্যায় এক এক করিয়া অনেকগুলি জীবন্ত মূর্ত্তি চলিয়া যাইতে লাগিল। কেহ হাসিতেছে—কেহ কাঁদিতেছে—কেহ ভ্রূকুটী ভ্রূভঙ্গ দেখাইতেছে—কেহ বা বিদ্রূপ করিতেছে। উদ্ভ্রান্তচিত্ত যামিনীভূষণ স্পষ্ট দেখিলেন, তাঁহার দুর্দ্দশাগ্রস্ত চিরহতভাগ্য বিধিবিড়ম্বিত কনিষ্ঠ সহোদর নলিনী—হাসিতে হাসিতে একখানি গভীর কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিল!! সবিস্ময়ে যামিনীভূষণ প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার অভ্যন্তর—কেবল অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার! স্বচ্ছ তরল—অন্ধকার!! নিবিড় তমরাশির উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সফেন সমুদ্র যেন তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্ত বিকট মুখব্যাদন করিয়া অগ্রসর হইতেছে!

যামিনীভূষণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন! কক্ষ মধ্যে ঘন ঘন পদচারণা করিতে লাগিলেন।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল "জল খাবার প্রস্তুত হইয়াছে, মা-ঠাকরুণ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" যামিনীভূষণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন,—কহিলেন—"চুপ চুপ—জল খাবারের কথা মুখে আনিস্ না! আমায় দুটী মুড়ি মুড়কী এনে দে।"

ভৃত্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া—যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া খবর দিল,—"বাবু বলিলেন—'জল খাবার তিনি খাইবেন না, তাঁহাকে দুইটী মুড়ি মুড়কি আনাইয়া দেওয়া হউক।"

সজনীর মাতা যে সমস্ত জল খাবার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ভৃত্যের দ্বারা বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন। যামিনী ভূষণ সে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী দেখিয়াই চমকিত হইয়া ভৃতকে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে তুই ক'রেছিস্ কি? এই সব জিনিষ নষ্ট করতে এনেছিস্? দাঁড়া-দাঁড়া যত্ন করে রেখে দি! দুদিন পরে যখন খিদের চোটে প্রাণ যাবে, তখন এই সব সামগ্রী একটু একটু করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাব!!" এই বলিয়া দাম্ভিক যামিনীভূষণ আপনার কোঁচার খুঁটে সমস্ত ফলমূল মিষ্টান্ন ঢালিয়া ভাগ করিয়া বাঁধিতে লাগিলেন!!

বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? যামিনীভূষণের মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার সূচনা আরম্ভ হইল।

ইহলোকের দণ্ড যদি ইহলোকেই পাইবার প্রথা থাকে, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। আরও ভয়াবহ লোমহর্ষণ চিত্র দেখিবার জন্য পাঠকগণকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ক্রমশঃ

বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[রায় সাহেব শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত লিখিত]

অনেকে হয় ত বলিবে, "পরমহংসদেব কি বাছিয়া বাছিয়া গিরিশচন্দ্রের মতই শিষ্য করিয়াছেন? তবে তাঁহার কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের মহাত্ম্য কোথায়?" "হাঁ মাহাত্ম্য আছে বৈ কি! মানুষও যেমন নানা থাকের আছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য ও সহচরও সেইরূপ নানা থাকের ছিলেন এবং এখনও আছেন। গিরিশের জীবনের গঠন যেরূপ, তাঁহার ব্রতও ছিল সেইরূপ। আবার ঠিক তাহার বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী—কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সেই চিরকুমার সন্ন্যাসী—বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ-মহারাজ;—ঠিক ইহার বিপরীত সুরে জগতে ত্যাগ ও সংযমের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন;—তিনিও ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেবের প্রিয়তম সন্তান,—অশেষ কৃপা ও শক্তি-প্রাপ্ত সন্ন্যাসী। আবার সাধুত্তম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিম্বা প্রফেসর মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত অথবা দীন দুর্গাচরণ নাগ—ইঁহারও ঠাকুরের পদাশ্রিত এবং বিশেষ কৃপা-প্রাপ্ত সন্তান; কিন্তু পরস্পর থাক্ আলাহিদা। কেননা, যে আধারে যে শক্তির ক্রিয়া সুচারুরূপে হইতে পারিবে, অন্তর্যামী তিনি,—তাহা জানিতেন। তাই, এক মিলন মন্দিরের সহযাত্রী হইলেও, প্রত্যেকের পথ ভিন্ন ভিন্ন। শক্তি-সঞ্চার তিনিই করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাঁদের ব্রত স্বতন্ত্র। গিরিশের দ্বারা যে কার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হইবে, স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা তাহা হইতে পারে না;—কিংবা প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দ্বারা যাহা জলের মত হইতে পারে, প্রজ্জ্বল-লোক-

শিক্ষক, নিরভিমান গম্ভীরাত্মা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অথবা একরূপ মৌন ব্রতাবলম্বী দীনতার প্রতিমূর্ত্তি স্বর্গীয় নাগ মহাশয় কর্ত্তৃকও তাহা সম্পন্ন হইবার নহে। ঠাকুরের ভাবে বলিতে হইলে বলিব,—একই পুলি-পিঠে, দেখিতে একরূপ বটে, কিন্তু পোর্ আলাদা। কোনটীতে ক্ষীরের পোর্, কোনটীতে কলাইয়ের পোর্, কোনটীতে বা ডালের পোর্। অথবা এক মাছ বাড়ীতে আসে বটে, কিন্তু সকলে একভাবে খাইতে পায় না। মার পাঁচটী ছেলে, মা-ই তাদের ধাত বুঝেন। তাই কাউকে তিনি মাছের পোলাও করিয়া দেন, কাউকে মাছের ঝোল খেতে দেন, কাউকে ভাজা, কাউকে বা অম্বল;—যার যা পেটে সয়। পেট-রোগা ছেলে যে, সে ত পোলাও হজম করিতে পারিবে না; তাই তার জন্ম ব্যবস্থা—মাছের ঝোল। সেইরূপ, এই সংসার রঙ্গালয়ের ব্যবস্থাও— কর্ত্তার ইচ্ছায় চলিয়া থাকে। যুগ-ধর্ম্মে পাশ্চাত্য আদর্শগুণে যখন সমাজে থিয়েটার থাকিবে এবং তাহার দ্বারাও লোক-শিক্ষা হইবে, তখন তাহার পরিচালন ও ব্যবস্থাভার যোগ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ ভিন্ন চলিবে কেন? থিয়েটারেও যখন "বিল্বমঙ্গলের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ নাটক কিম্বা "বলিদানের" মত সমাজ-চিত্রও লোক চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে হইবে;—তখন তাহার প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ হয় কে? চিন্তামণির মত পতিতারও যদি উদ্ধার হইতে পারে, জগাই মাধাইয়ের মত পাষণ্ড কিংবা কালাপাহাড়ের মত ধর্ম্মদ্বেষীরও চৈতন্য হওয়া যদি সম্ভবপর হয়, তবে তাহার স্বরূপ চিত্র অঙ্কিত এবং পরে তাহা অভিনীত হয়—কোন্ উপায়ে? এ বিভাগেরও ত একজন দক্ষ সমজদার সাহিত্য শিল্পী অথচ প্রগাঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন কর্ম্মী চাই? এখন সে কর্ম্মী হয় কে? কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দ কি এমন স্থানে আসিয়া আসর জমাইবেন? না, তাহা তিনি পারিবেন? পরোক্ষে স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী,

অথবা হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় আসিয়া রঙ্গালয়ের লিডার হইয়া নটনটী লইয়া থিয়েটার চালাইবেন? তাহা ত হইবার নহে? সুতরাং যার যে কাজ, তা তারেই সাজে। যার যে থাক্ সে থাকে সেই শ্রেষ্ঠ। গিরিশ একরূপ জন্মাবধি নট ও নাটককার, স্বভাব-কবি ও সাহিত্য-শিল্পী, লোক-চরিত্র সম্যক অভিজ্ঞ ও সহৃদয়, রসিক ও রসচূড়ামণি; মজলিসী ও আমোদ প্রিয়,—আমোদের জন্য সুস্থান কুস্থান তাঁহার জ্ঞান নাই, সামাজিক লজ্জা-মান-ভয়ের ধারও বড় একটা তিনি ধারেন না, এমন একজন প্রতিভাসম্পন্ন ও উদ্‌যোগী পুরুষসিংহেরই ত থিয়েটার রূপ সাম্রাজ্য পরিচালনের অধিকার সম্ভবে। নিরীহ দীন নাগ মহাশয় বা আধুনিক কোন রুচি-প্রিয় ইংরেজী সভ্যতা আদব কায়দায় পরিচালিত বঙ্গীয় কবি কি গিরিশের সে আসন লইতে পারেন? না,—তাঁহার দ্বারা নাট্যশালার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়? সম্পন্ন ত হয়ই না—বাড়ার ভাগে গিরিশের যে জ্বলন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস ও অকপট ঈশ্বরানুরাগ, তাহাও হয়ত শেষোক্ত সভ্য কবি মহাশয় নাট্য-সাহিত্যে দেখাইতে গিয়া সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য ও উপহাসাস্পদ হইবেন। কেননা সংসারের আর সকল জিনিষ বহ্বাড়ম্বের ও বাহ্য-চাকচিক্যে একরূপ মানাইয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্মানুরাগ বা ঈশ্বর-বিশ্বাস জিনিসটীতে ত মেকি চলে না, উটি আত্মার জিনিস, আত্মাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অবশ্য গিরিশও যে এ অংশে চরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলি না; দোষ ত্রুটী দাগ্ দুর্ব্বলতা—তাঁহারও ছিল; তবে গুরু-কৃপায়, ভোগের মধ্যেও যে তাঁর একটা ঐশ্বরিক যোগও ছিল, প্রবৃত্তি মার্গ দিয়াও যে তিনি অন্তরের অন্তরে নিবৃত্তির পথ ধরিয়াছিলেন, অন্তরে ডোর কৌপীন লইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মের মর্য্যাদা দিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি এই জন্য যে,

স্বয়ং অহেতুক কৃপাসিন্ধু পতিতপাবন তাঁহার পতিত অথচ কৃতী সন্তানকে শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিয়াছিলেন। নইলে গিরিশ কখনই এ কথা বড় গলা করিয়া বলিতে পারিতেন না যে,—

"রাখিতে পারি হে যদি গুরুপদে মতি,
বুঝিব হে অভিমান! তোমার শকতি।
মনোরমা ভার্য্যা পাব, পাব অর্থ যাহা চাব,
অতিদীন হ'য়ে হব, ধরণীর পতি।
অতি দীন হ'য়ে পাব, অতি উচ্চ গতি।"

আশার এই মোহন মন্ত্র, হৃদয়ের এই জলন্ত বিশ্বাস, যে কবি এমন স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার জন্মার্জ্জিত সুকৃতি ও সৌভাগ্য অস্বীকার করায় অপরাধ হয়। গিরিশই প্রকৃত পরলোক বিশ্বাসী হিন্দু কবি; কেননা তিনি জলন্ত বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করিতেন; হিন্দু দেব দেবীর মাহাত্ম্য মানিতেন। "অতি দীন হয়ে পাব অতি উচ্চগতি—"—আশার কি মহীয়সী ও মর্ম্মস্পর্শিনী উক্তি! যে কবি নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে এইরূপ সরল অথচ কঠোর সত্য এবং আত্ম-চরিত্র-চিত্র লেখনীমুখে প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার মনের বল অনুভবনীয়,—বুঝাইবার নহে। কেন না, সরলতা ও সত্য-প্রিয়তাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। ইন্দ্রিয়-তাড়নায় কোন দুষ্কার্য্য করিয়া ফেলিয়াও, যে তাহা নির্ভীক ভাবে যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে পারে, ঈশ্বরের চক্ষে তাহার সাত খুন মাপ। তবে সে দুষ্কার্য্যের জন্য তাহার অনুতাপ ও অন্তর্দাহ হয় কি না, তাহা অবশ্যই বিচার্য্য। গিরিশের যে তাহা হয় নাই, ইহা কে বুকে হাত দিয়া বলিতে পারে? কপটের নিকট গিরিশ কপট, কিন্তু সরলের নিকট গিরিশ শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংক্রান্ত কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন হইত, তখন

প্রকৃতই তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া কথা কহিতেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুভরা-ক্রান্ত হইত, কণ্ঠস্বর কেমন অতি কোমল, পবিত্র ও কাঁদ কাঁদ হইত,—মন কাদার মত নরম হইয়া যাইত। যে কোন সামান্য ব্যক্তিকেও তখন তিনি সমযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া ভাবিতেন। আত্মাভিমান বা আত্মবুদ্ধির প্রসার চেষ্টা, তখন তাঁহাতে আদৌ পরিলক্ষিত হইত না। কখন বা জিজ্ঞাসু হইয়া অতি দীন ভাবে তিনি বক্তার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেন। গিরিশের এ সময়ের সেই স্বর্গীয় শান্ত মূর্ত্তি স্মরণ করিলেও চোখে জল আসে। ঐশ্বরিক ভাব-বিনিময়ের এই শিশু জনোচিত সরলতা ও সত্য প্রিয়তার স্বর্গীয় ছবি যিনি গিরিশের সহিত কথা কহিয়া দু দণ্ড দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। আর গুরুর প্রতি একনিষ্ঠতা, নির্ভর ও বিশ্বাস তাঁহার এতই গভীর ছিল যে সে গভীরতার মাপ আমাদের আয়ত্তে নাই। গিরিশের নিজ ভাষাতেই তাহা শুনুন ;—

"ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণার,
হে দীন শরণ!
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলায় ধরায়—
বরিষার বারি বরিষণ।
বিধবার ধনাপহরণ,
ভ্রূণ-হত্যা, কুলস্ত্রীগমন ;
ত্যজি কন্যা-পুত্র-নারী, পানাসক্ত অত্যাচারী,
লোকত্যজ্য ঘৃণিত জীবন,
তব দ্বার মুক্ত তার পতিতপাবন।"

আত্ম-নিবেদন অকপট হৃদয়ে গিরিশ ইষ্টদেবতার চরণে এই গাথা গান করিয়াছেন। সুতরাং গিরিশ অন্তরে মুক্ত। যে কটা দিন সংসারে ছিলেন, বাহিরের কর্ম্মপাশ তাঁহাকে জড়াইয়া ছিল ; এখন

সে পাশ চিরমুক্ত। এ অমর গাথার সম্যক বিচার বিশ্লেষণের দিন এখনও আসে নাই, উত্তরকালে কোন সত্যানুরাগী শক্তিধর পুরুষ তাহা সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ভক্তবৃন্দের জন্য গিরিশ যে অমূল্য ভাবসম্পদ বঙ্গ-সাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন, একদিন লোকে তাহার মর্য্যাদা বুঝিবে। তাঁহার "বিল্বমঙ্গল" ও নসীরাম" এ বিষয়ে অতুল্য। এখন কেবল কাব্য-হিসাবে লোকে তাহা পাঠ করে, কিন্তু একদিন তাহা আত্মার পুষ্টি ও উপভোগের জন্য, সমগ্র ভক্ত-সমাজ তাহা হৃদয়ে ধারণ করিবে।

"শ্রীম—"কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত উপভোগ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের আজিও হয় নাই, তাঁহারা গিরিশের সঙ্গীত-মুক্তাবলীর সহিত এই স্বর্গীয় কবিতাটিও পাঠ করিবেন, আমার এই অনুরোধ। নাট্যাচার্য্য-বেশী গিরিশ, গ্যারিকরূপী অভিনেতা গিরিশের প্রশংসা ত লোকের মুখে-মুখে ফিরিয়া থাকে; কিন্তু গুণে কোন্ শক্তিতে তিনি এ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বুঝা দরকার। দৈব-কৃপা অপাত্রে হয় না, সুপাত্রেই হইয়া থাকে। ভক্তের ভগবান্ গিরিশের সহায় হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাহাও গিরিশের জন্মার্জ্জিত সুকৃতি-গুণে। সে সুকৃতীর মূল কথা এখানে একটু উদ্ধৃত করিব। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কবিতায়" গিরিশ গিরিশের ভাষাতেই বলিতেছে :—

"কে তোমা বুঝিতে পারে পূজা জানে কেবা
অজ্ঞান মানব!
আপন উন্নতি মাত্র তব পদ সেবা
তব ধ্যান পরম উৎসব—
গোষ্পদ দুরন্ত ভবার্ণব,
দুষ্ট ষড় রিপু পরাভব,

ভুলায় যন্ত্রণা-জ্বালা, তব নাম জপমালা,
অহঙ্কার দমিত দানব,
অর্চ্চনার অধিকার—অতুল বৈভব।
নিরৈশ্বর্য্য আসিয়াছে— মাধুর্য্য লইয়ে,
প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব, মানব মাঝে পরশিতে হিয়ে,
অমিশ্রিত মাধুর্য্য অধরে।
পাছে নর নাহি আসে ডরে,
দীন বেশে ডাক সকাতরে ;
হরিবারে মন প্রাণ, কর নাথ আত্মদান,
সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন-মাধুরী হেরি অভিমান হরে
চিনালে চিনিতে পারে, নহে অসম্ভব—
পুরুষ প্রধান !
মত্ত চিত্ত মহাঘোর বিষয় আহব—
হৃদয়ে না রহে তব স্থান।
স্বপ্রকাশ হও বিদ্যমান,
জ্ঞানাঞ্জনে করি দৃষ্টি দান ;
তবু ক্ষণে মূঢ় মন হয় রূপ বিস্মরণ,
ইন্দ্রিয় তাড়না বলবান !
হৃদপদ্ম বিকাশিয়া হও অধিষ্ঠান।”

এমন অকপট বন্দনার ছবি যে কবি কাব্যতুলিকায় এমন অপূর্ব্ব ভাবে আঁকিতে পারেন, তাঁহার স্মৃতি-পূজায়ও পুণ্য আছে। আজ এই শোক-স্মৃতি-প্রসঙ্গে গিরিশের স্মৃতি পূজা করিয়া আমরাও ধন্য হইলাম।

ধন্য হইবার দুইটী কারণ আছে। প্রথম, বয়ো-কনিষ্ঠ এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে সামান্য হইলেও আমরা গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক এবং এক উপাস্য-দেবের শ্রীচরণাশ্রিত পতিত-সন্তান। তবে ভাগ্যবান্ গিরিশ সেই পতিতপাবনের সাক্ষাৎ কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া জন্ম সফল করিয়া গিয়াছেন, আর সুকৃতির অভাবে আমরা আজিও বিফলে দেহ ধারণ করিয়া আছি মাত্র। তবে ভরসা এই, গিরিশ পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, ভাগ্যে থাকিলে, আমরা সেই পদাঙ্কের অনুসরণ করিতে পারিব। ভক্তকে ধরিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। গিরিশকে ধরিয়াছিলাম, এখনও ধরিয়া আছি, যদি তিনিই গুরু মিলাইয়া দেন। ভগবান্ তাঁর শক্তি-মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিলেন,—সেই শক্তি হইতেই ক্রমে তাঁহার ভক্তি আসে। সেই ভক্তিতেই ভগবান্ বাঁধা পড়েন। আমাদের এ দু'য়ের কিছুই নাই,—মুক্তাত্মা গিরিশই যদি এখন দয়া করিয়া আমাদের পিপাসার জল মিলাইয়া দেন! হায়! পরমাত্মার বিয়োগেও যে ব্যথা পাই নাই, গিরিশের অন্তর্দ্ধানে আজ যেন সেই বেদনা বোধ করিতেছি। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই, তাই কি ঠাকুরের এই খেলা?

কত কথাই আজ মনে পড়িতেছে। সেই শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রি ঘোরা গম্ভীরা রজনী;—আমরা দুইজনে মুখোমুখি হইয়া এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া। আজ তিন বৎসর পরে' প্রবন্ধের এই উপসংহার-ভাগ রচনাও সেই শিবচতুর্দ্দশীর গভীর নিশীথ কালে। "ব্যোম রামকৃষ্ণ" রবে ভক্তবীর গিরিশ,—ঠাকুরের কথায় আমায় মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন,—আর আজিও সেই পুণ্যতিথিতে তেমনি নিরব নির্জ্জনস্থানে বসিয়া ঠাকুরের মহিমায় চিন্তার সহিত গিরিশের সেই অমৃতময়ী স্মৃতি আমি উপভোগ করিতেছি! কিন্তু হায়! আজ গিরিশ নাই, আমি একক! একক? কে বলিল আমি একক? ঐ যে গিরিশ আমার

সম্মুখে! সেই রামকৃষ্ণ-ভাবে ভরপুর, উজ্জল বিশাল সজল চক্ষু দীর্ঘাকৃতি উন্নত বপুঃ গুরুগম্ভীরমূর্ত্তি, ঠিক তেমনি প্রশান্তভাবে আমার পানে চাহিয়া আছেন। জানি না তুমি ভাগ্যবান্, আমাতে শক্তি সঞ্চার করিতেছ কি না! ছোট ভাই বলিয়া তুমি আমায় দেখিয়াছিলে; অপরাধী আমি;—হায়! শেষ-ক্ষমা চাহিবারও অবসর আমায় দিলে না।

ধন্ত হইবার দ্বিতীয় কারণ,—গিরিশের ঐ কবিতা পাঠের সহিত ঠাকুরকেও গিরিশকে এক সঙ্গে ভাবিতে পারিব; উপস্থিত তাহাই যা সান্ত্বনা ও আশা। গিরিশ বাহিরে যা থাকুন, অন্তরে পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়াছিলেন। কবিতার ঐ উদ্ধৃত অংশটুকুই তাহার জলন্ত প্রমাণ। গিরিশের জীবিতকালে যাঁহারা নানা কারণে গিরিশকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবার সুবিধা পান নাই, এখন তাঁহাদের সে অন্তরায় চিরবিদূরিত; এইবার ভাল করিয়া গিরিশকে তাঁহারা দেখুন, আমাদের এই প্রার্থনা। গিরিশের স্থূল দেহ গিয়াছে মাত্র, বাকি সবই আছে; তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ভগবদ্ বিশ্বাস আছে, এই বিশ্বাসই সকলে লক্ষ্য করুন; তাঁহার কাব্য নাটকাবলীর দিক্ দিয়া লক্ষ্য করুন, দেখিবেন গোবরেও পদ্ম ফুটিয়াছিল। সেই পদ্মের সৌরভে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য আজ আমোদিত। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র বীরের মত কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোন নিষেধ বিধি ছিল না, ঠাকুরের চাপরাও হুকুম। হইতে পারে, তাহাতে তোমার আমার স্বার্থের ক্ষতি, আর দশ জনের মনঃক্ষোভের কারণ। কিন্তু সে ক্ষতি বা মনঃক্ষোভ নাই কোন বস্তুতে? তাহার তুলনায় তিনি যে অমূল্য ভাব-সম্পদ ও ভক্তি বিশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন, যে স্বর্গীয় গীতি, অদ্ভুত নাট্যকীর্ত্তি ও ভগবদ্ভক্তির অমৃতময় ফল অকাতরে বিলাইয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া, এস ভাই এস, আজ আমরা সেই ক্ষণজন্মা দৈবকৃপাপ্রাপ্ত শক্তিধর পুরুষের পুণ্যস্মৃতির পূজা করি।

জীবিত কালে নানা কারণে গিরিশচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে আশানুরূপ যশঃ ও সম্মান পান নাই, আশা করি, এখন তিনি সুদ সমেত তাহা পাইবেন। অবস্থা-বিপাকে পড়িয়া মহাকবি সেক্সপিয়রও একদিন রঙ্গালয়ের হীন কর্ম্মচারী রূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ; আজ সেই মহাকবির জন্মস্থান—সেই ষ্ট্রার্ড ফোর্ড অন্ আভান তীর্থরূপে পরিণত। সে হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে চিরদিন তিনি রাজার ন্যায়ই কাটাইয়া গিয়াছেন ;—কখন সামান্য জনের ন্যায় তাঁহাকে থাকিতে হয় নাই। সামাজিক বা সাহিত্যিক মান তিনি চানও নাই, তেমন পানও নাই। এখন সে মান পাওয়া না পাওয়া তাঁহার পক্ষে সমান কথা। কেননা, যে লোকে তিনি এখন অবস্থিত, সেখানে এ দুটা জিনিসের অস্তিত্বই নাই। তবে যাঁহারা এ দুটো জিনিসের বড় কদর করেন, আশা আছে, এইবার তাঁহারা ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া গিরিশের সাহিত্য-প্রতিভার ওজন করিতে পারিবেন। ওজন করিলে দেখিবেন গিরিশের অমূল্য গীতাবলী, "বিল্বমঙ্গল", "নসিরাম", "পূর্ণচন্দ্র", "প্রফুল্ল", "বলিদান" প্রভৃতি নাটক বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় ; আজ পর্য্যন্ত কোন নাটককার এ অংশে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা আমাদের সরল বিশ্বাস। তাঁহার "চৈতন্যলীলা", "রূপসনাতন", "বুদ্ধদেব" প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক নাটকে, এক সময় দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, এখনও তাহা হইতেছে, তাহা স্মরণ করিয়াও সামাজিক মহোদয়গণের গিরিশের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অভিনয়ে গিরিশের প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অবিসংবাদিত। দুইটী ছবি আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না—"নসীরাম" ও "যোগেশের" ভূমিকা। নসীরামে সেই ভগবান্ কর্ত্তা, আর জীব অকর্ত্তার সেই ভাব, ভঙ্গি ও খেলাখেলা ভাব ; আর যোগেশের সেই অন্তিম দৃশ্য—

"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল"—চিরদিন আমাদের অন্তরে মুদ্রাঙ্কিতে থাকিবে।

লক্ষ্মীমন্ত ভাগ্যবান্ পুরুষ তিনি ; যখন যে থিয়েটারে যাইতেন, লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাঁহার নামেরই যেন কি একটা আকর্ষনী শক্তি ছিল ; যে থিয়েটারে গিরিশ চন্দ্র, সেই থিয়েটারের জয়-জয়কার।

কিন্তু ইহার মূলেও সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু পরমহংস দেবের পুণ্য-প্রভাব দেখিতে পাই। কেননা, গিরিশকে কৃপা করিবার উদ্দেশে তিনি স্বয়ং সশরীরে কয়বার গিরিশের থিয়েটার দেখিতে শুভাগমন করিয়া-ছিলেন। এবং চৈতন্যলীলা প্রহ্লাদচরিত্র রূপসনাতন ও দক্ষযজ্ঞের অভিনয় দেখিয়া গিরিশকে আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহদান করিয়াছিলেন। গিরিশের জিজ্ঞাসার উত্তরে অন্তর্য্যামী স্পষ্টই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"না, তুমি যা করিতেছ, তাই কর।"......অর্থাৎ থিয়েটারই কর। ঠাকুরের এ কথা বলিবার হেতু বোধ হয় এই,—ঐ—পথ দিয়াই তিনি তাঁর শরণাগত সন্তানকে পার করিবেন. তৎসঙ্গে আরও অনেকের উপকার হইবে। তাহা হয় নাই কি ? গিরিশের নাটকা-বলীতে যেমন ধর্ম্ম ভাব প্রষ্ফুটিত, আধুনিক আর কোনও নাটককার বা কবি তেমন অপূর্ব্ব কৌশলে আমোদচ্ছলে লোক শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ? কিন্তু বড় ক্ষোভ রহিল, এ কথাটা গিরিশের জীবিত কালে ভাল করিয়া লোককে বলিতে পারি নাই। তথাপি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই আমাদের চিত্ত-প্রসাদ হইয়াছে,—গিরিশও তাহা শুনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া ভক্তের হিসাবে তাঁহার নিকট একটু অনুযোগ করিয়াছিলাম, জীবনে বড় ক্ষোভ রহিয়া গেল,—সেই কাল বাক্যই আমাদের ফেলিয়া গেল ; তাঁহাকে আর থিয়েটারের আসরে নামিতে হইল না। হায়! কঠোর

কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া শেলতুল্য এ স্মৃতি আমার হৃদয়ে বাজিয়া রহিল। অথবা ইহাও যে আমার মঙ্গলের জন্য নয়,—কে বলিল? কেননা, ঠাকুর নিজেই শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, ভক্ত, ভগবান, ও ভাগবত এক;—গিরিশের মধ্যেই হয়ত কালে আমি এ তিনই দেখিতে পাইব। এখন সেই বীরভক্ত অকপট বিশ্বাসী গিরিশের আশীর্ব্বাদ ও তাহার পারের কর্ত্তা—পতিত পাবন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপা।

অন্তিমে শেষ-নিশ্বাসের সহিত গিরিশ "রাম" নাম লইয়াছেন, তাঁহার এই শোক-স্মৃতি-প্রসঙ্গে আমরাও সম্মিলিত কণ্ঠে সেই পবিত্র নাম উচ্চারণ করি—"জয় রামকৃষ্ণ"!

নববর্ষাবাহণ।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

এস এস নববর্ষ এস! এস এস উনবিংশ সাল এস! আজ শুভ ১লা বৈশাখে শুভ রবিবাসরে, নূতন বসনে, নূতন ভূষণে, নূতন খাতায়, নূতন ছাতায়, নূতন মনে, নূতন প্রাণে, নূতন আশায়, নূতন ভরসায়, নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্যমে,—কাঙ্গালী বাঙ্গালী সকলে মিলিয়া তোমাকে আদর অভ্যর্থনা আপ্যায়িত আবাহন করিতেছি—তুমি বঙ্গদেশে এসে সময়সিংহাসনে বসে-হেসে রাজত্ব কর! পূর্ণ একবৎসর-কালের জন্য বাঙ্গালার তোমার একাধিপত্য,—পূর্ণ একটি বৎসর ধরিয়া তুমি যথেচ্ছাক্রমে স্বত্বভোগ করিতে থাক! কেহ বারণ করিবে না—কেহ ভাগ বসাইবে না—কেহ তোমার কার্য্যের কৈফিয়ৎও চাহিবে না! এই পূর্ণ এক বৎসর ধরিয়া তুমি কত কাণ্ডই না করিবে। কত রাজেশ্বরকে ভিখারী করিবে,—কত গৃহস্থকে ফকীর করিবে, কত

পুত্রকে পিতৃমাতৃহীন করিবে,—কত পিতামাতাকে পুত্রধনে বঞ্চিত করিবে,—কত অভাগিনীর কোমল কর হইতে কঙ্কন খসাইবে,—কত দীনহীন দরিদ্র কেরাণীর অন্ন মারিবে,—কত হতভাগ্যকে বন্ধুবান্ধবশূন্য করিবে,—কত গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবে। বর্ষদেব! তোমার মনে কি আছে তাহা তুমিই জান, আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই! তবু নূতন আসিতে দেখিয়া ভয়ে ও ভক্তিতে তোমায় আমরা আবাহন করিয়া খাতির করিতেছি! তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। ভাল কাজ কি তুমি কিছু করিবে না? তা করিবে বৈকি! ও পাড়ার রামসুন্দর মুদি মুড়ী মুড়কী বেচিয়া অলুপোড়া ভাত খাইয়া,দিন গুজরাণ করিতেছে। হঠাৎ একদিন হয়ত তোমারই সময়ের মধ্যে দেখিব—সে কলিকাতার সহরে সরকার বাবুদের আট বিঘা জমীশুদ্ধ বসত বাড়ীখানি কিনিয়া মহা সমারোহ ব্যাপার লাগাইয়া দিয়াছে। নন্দ মুখুয্যে কুড়ী টাকা মাহিনার ওজন সরকারি করে—হঠাৎ হয়ত সাহেবের সুনজরে পড়িয়া ৪০০৲ টাকা মাহিনায় অফিসের বড় বাবু হইয়াছে! মধু মিত্রের ছেলেটী বি, এ পাস করিয়া হয়ত শুভ বিবাহ করিয়া কন্যার বাপের ভিটে বিক্রয় করাইয়া ৫০০০৲ টাকা নগদ লাভ করিবে। বিনোদ মল্লিক চিরকাল ছেঁড়া কাপড় পরিয়া দিন কাটাইয়া নিঃসন্দেহ ক্রোর টাকার অধিক বিষয় রাখিয়া দেহ রক্ষা করিবেন—আর পরদিন হয়ত দেখিব তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান কার্ত্তিক মল্লিক অশুচি অবস্থাতেই ল্যাণ্ডো জুড়ী মোটর গাড়ী কিনিয়া "ইত্যাদি" রাখিয়া চারিহাতে কাপ্তেনি শুরু করিয়াছে! "অমুক" ট্রেডিং কোম্পানীর মালিক ইনসলভেন্সি ফাইল করিয়া একসঙ্গে পাঁচখানি তালুক কিনিয়া হয়ত শুনিব—দেশে গিয়া রাতারাতি একজন বড়দরের জমীদার হইয়া পড়িয়াছেন। নিরক্ষর মুখুয্যে মহাশয় টাকার জোরে "রায় বাহাদুর" হইতে হয়ত শুনিব একেবারে "মহারাজা" খেতাব পাইয়াছেন!

বটতলার ঔপন্যাসিক শঙ্কর সাণ্ডেলের "প্রমোদবালা" বাঙ্গলায় অপাঠ্য গ্রন্থ—হয়ত দেখিব সেন্ট্রাল টেকষ্টবুক কমিটি কর্ত্তৃক পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীর স্ক্যাভেঞ্জারের সর্দ্দার হরিনারায়ণ বাঁড়ুয্যে চেয়ারম্যানের সুনজরে পড়িয়া হয়ত একেবারে অ্যাসেসারের পদ পাইয়াছেন দেখিতে প্যাইব। কেষ্টো পোদ্দার শ্রীরাম দত্ত মহাশয়ের পুত্রকে ৫০,০০০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট কাটাইয়া পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিলেন; ছয় মাস ধরিয়া তাহার মামলা চলিতেছে; হয়ত খবর শুনিব পোদ্দারের পো মামলা জিতিয়াছেন—দত্ত মহাশয়ের সমস্ত বিষয়ের এক্ষণে তিনিই অধিকারী হইয়া সচ্ছন্দে খোসমেজাজে ভোগদখল করিতে রহিতেছেন। রাধানগরের জমীদার আত্মহত্যা করিয়াছেন,—হয়ত শুনিব কলিকাতার একজন নগণ্য এটর্ণি তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্র এবং তাঁহার বিধবা পত্নীর তত্ত্বাবধায়ক এবং সমস্ত জমীদারীর একজিকিউটার নিযুক্ত হইয়াছেন। কমলাচরণ ডাক্তারের বাড়ী বন্ধক পড়িয়াছে; হয়ত দেখিব এবার প্লেগ ও কলেরার মরসুমে তিনি আর দুইখানি বাড়ী করিয়াছেন। রমেশ উকীলের ট্রামের পয়সা জোটেনা,—হয়ত শুনিব ও পাড়ার বসু বংশের পার্টিসন্ স্যুটের ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি একখানি ব্রুহাম গাড়ী কিনিয়াছেন এবং আদরিনী পত্নী মনোমোহিনীকে ৬০বাট ভরির এক ছড়া সোণার বিছা গড়াইয়া দিয়াছেন! এই রকম কত কি শুনিব, দেখিব, জানিব, তাহার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে? নিবারণ আজিড থিয়েটারে পাঁচ টাকা মাহিনায় গার্ডের কাজ করিত, হয়ত দেখিব দুদিন পরেই সে থিয়েটারের একজন ঘোর অ্যাক্টর হইয়াছে। নিমি গোয়ালিনীর মেয়ে বিন্দি তাহার মাতার সঙ্গে এক্ষণে লোকের বাড়ী ঘুঁটে বেচিয়া বেড়াইতেছে; হঠাৎ হয়ত একদিন শুনিব বিন্দুবাসিনী বাংলার ষ্টেজের প্রধান অভিনেত্রী! তাহার বেজায় সুখ বাড়িয়াছে।

অঙ্গে গহনা, সিন্দুকে টাকা আর ধরে না! তাই বলিতেছিলাম হে বর্ষঠাকুর! তোমার মহিমা অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অভাব্য! তুমি যে কি করিবে অথবা কি না করিবে, কত অসম্ভবকে সম্ভব করিবে,—কত অঘটন ঘটাইবে তাহা তুমিই জান!

গতবর্ষ শ্রীমান "১৩১৮ সাল" মহাশয় যখন প্রথম শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন—তখন এমন দিনে এই রকম ভালমন্দ কত আশাই না করিয়াছিলাম! কিন্তু হায়! আশার অর্দ্ধেক ফল তো দূরের কথা, সিকির সিকিও ফলিল না! "অষ্টাদশ সন" মহাশয় এমন শুভক্ষণে এখানে আসিয়াছিলেন—যে এক বৎসর রাজত্বের মধ্যে কি কাণ্ড কারখানাই না ঘটিল! একটী একটী করিয়া কত দুর্ঘটনাই না ঘটিল। অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, আকাল দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, (ম্যালেরিয়াত আছেনই), বজ্রাঘাত, ঝঞ্জাবাত, ভূমি-কম্প ইত্যাদি বর্ষ মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া একে একে আপন আপন মহিমা বিস্তার তো করিয়া গেলেনই! আবার তাহার উপর রাজধানীকে রাজধানীটাই উড়াইয়া দিয়া এমন সাধের কলিকাতাটাকে একেবারে জখম করিয়া দিলেন। যদি বল,—মনুষ্যজীবনের একটী মহা পুণ্যময় কার্য্য —"অষ্টাদশ বর্ষ মহাশয়ের" পুণ্যে সংসাধিত হইয়া-ছিল—"রাজদর্শন" "সম্রাটের ভারতে শুভপদার্পণ"! তা বটে! এ কথা সহস্রবার স্বীকার্য্য! রাজারাণীর শুভপদার্পণে ভারতবাসীর জীবন জনম যথার্থই ধন্য হইয়াছে! কিন্তু "দর্শনের" ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ ভয়াবহ হয় নাই কি? শান্তিরক্ষক মহাপ্রভুদের শান্তিরক্ষা-কার্য্য ব্যপদেশে রাজভক্ত প্রজাগণকে অবিচারে রুলের "গুঁতাপ্রদান" সেটা অনেকটা "ফুলের মধু আস্বাদনের সঙ্গে হুলের যন্ত্রণা অনুভবের মতন" নয় কি! তা সে যা হোক—"কষ্ট না করিলে কেষ্টো মেলে না" ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু সেটা ভাল রকমই জানে। তাই বড় কষ্ট পাইয়াও

দেবতা দর্শন করিয়া, সে সকল কষ্ট উপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সে গুঁতার বেদনা সারাইতে অনেক শিশি আর্ণিকার প্রয়োজন হইয়াছিল! যদি বল—"বর্ষদেবের কৃপায় বেঙ্গলের পার্টিসন রদ্ হইয়াছিল, সেটা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়?" খুব—খুব সৌভাগ্য! সম্রাটের জয় জয়কার হোক্। রাজসিংহাসন অক্ষয় হোক; সম্রাট সম্রাজ্ঞী অমর হইয়া থাকুন,—সপ্তকোটি বাঙ্গালী আমরা, চতুর্দ্দশ কোটী হস্ত তুলিয়া রাজারাণীর যশোগান করিতেছি! যার জন্য বঙ্গে এত অশান্তি,—এত কাণ্ড, এত হুলস্থূল, এত দাঙ্গা হাঙ্গামা, এত মনঃক্ষুণ্ণ,—নেতৃবৃন্দের এত হাহাকার, এত প্রাণপাত করিয়া চীৎকারধ্বনি, এত বক্তৃতা, ঘাটে মাঠে মিটীং, ন্যাশানাল ফণ্ডে এত চিটিং, স্কুলবয়ের এত হেড ইটিং শেষ চুলোর পার্টিসন, সম্রাটের প্রবল অনুকম্পাবাত্যায় একেবারে বাঙ্গলা-দেশ থেকে সন্ সন্ সন্ করিয়া উড়িয়া গিয়া রূপান্তর হইয়া পড়িল কিনা একেবারে বেঙ্গল আর উড়িষ্যা বিহারের মাঝখানে! বাঙ্গালীর ঘড়ে প্রাণে আসল,—আপদ যেন বিদায় হইল,—আবদারে বাঙ্গালী আপনার গোঁ বজায় রহিল দেখিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু যে "অষ্টাদশ বর্ষ ঠাকুর"! পার্টিসন তো উড়িয়া গেল, সেই সঙ্গে ল্যাজে বাঁধিয়া কি লইয়া গেল তাহার খবরটা জানা আছে কি? এই রাজধানী! বুঝেছ, এই রাজধানী কলিকাতা! লণ্ডনপ্রোতম ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখের সহর এই রাজধানী! আর বিহার উড়িষ্যা দুটাকে ফাউস্বরূপ (বাঙ্গালার ডান হাত বাঁ হাত) সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইল! এখন এইবার ঝট্‌পট্ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়টা হইলেই—ব্যাস্—কলিকাতা পুরির সশরীরে স্বর্গারোহণ! তাই বলিতেছিলাম,—হে অতীতবর্ষ মহাপ্রভু! তোমার খুরে-খুরে দণ্ডবৎ! তুমি বাঙ্গলায় যাহা করিয়া গেলে, সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত হাড়ে হাড়ে বাঙ্গালী তোমাকে চিনিয়া রাখিবে! ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে তোমার নাম লেখা থাকিবে! ছাত্রগণ সমস্ত

পড়া উপেক্ষা করিয়া তোমার নাম জপমালা করিয়া রাখিবে! শিক্ষকগণ—পরীক্ষকগণ সর্ব্বাগ্রে ছাত্রদিগের নিকট তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে? শুধু কি তাই? তোমার সময়ে কতগুলি সাহিত্য গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল বল দেখি! কবিবর ৺মনোমোহন বসুকে হারাইলাম,—নটগুরু বাণীর বরপুত্র বঙ্গের সেক্সপীয়র ৺গিরিশ চন্দ্র ঘোষ নাট্যজগৎ অন্ধকারময় করিয়া আমাদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন! প্রবীণ সাহিত্যসেবী ৺বীরেশ্বর পাঁড়ে কাশীধামে দেহ রক্ষা করিলেন! চক্ষের উপর কত কত প্রাণের বন্ধু আত্মীয় স্বজন দেখিতে দেখিতে ফাঁকি দিয়া পালাইল। ছি-ছি হে অতীত সন ১৩১৮ সাল! তোমায় ধিক—শতবার ধিক—সহস্র সহস্র বার ধিক!

এইবার উনবিংশ ঠাকুর! এইবার তোমার পালা! দেখি তোমার মনে কি আছে! ভাল যাহা করিবে তাহা মনে মনেই বুঝিতেছি। মুখে প্রকাশ করিতে সাহস করি না,—কারণ, দিনকাল বড়ই খারাপ!! এইটী করিও দেবতা,—ছেলেপুলে লইয়া ঘর করি, বিধির বিপাকে প্রাণটা যেন না হারাই! যে রকম টেক্‌সো বাড়িবার ধুম; যে রকম জলের মিটার বসাইবার হাঙ্গামা,যে রকম পুলিসে নাটক পাশ করিবার ব্যবস্থা, যে রকম চাকরী বাকরী টাকা কড়ির বাজার, এই অবস্থায় কোন গতিকে পৈতৃক প্রাণটী যেন বজায় থাকে! তোমায় করজোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে আবাহন করিতেছি—হে সন ১৩১৯ সাল!—

ত্বং ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু প্রসীদ।

বিলাতি রঙ্গিণী।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নদীগর্ভে নিমজ্জিতা দুঃখিনী মেরিয়াসের অতঃপর কি হইল তাহা জানিবার জন্ম পাঠকবর্গ নিঃসন্দেহ উৎসুক হইয়াছেন! সুতরাং এইবার তাহার তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক। ভীষণ তরঙ্গসমাকুল নদীস্রোতে মুখে একটী বিপন্না যুবতীকে এইরূপে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া নদী তীরে বিস্তর লোকের জনতা হইল! যুবতীকে মৃত্যুমুখে পতিতা দেখিয়া কূলে দাঁড়াইয়া সকলেই—"হায়—হায়—"তোল, তোল"—"রক্ষা কর, —রক্ষা কর" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন বটে—কিন্তু কেহই অভাগিনীকে উদ্ধার করিবার জন্ম নদীগর্ভে ঝাম্প দিয়া আত্ম-প্রাণ বলি দিতে অগ্রসর হইল না। সেই সহস্র সহস্র স্ত্রীপুরুষের চক্ষের উপর মেরিয়াস জলমগ্না হইল।

হায়! এ সময় এই স্থানে মিঃ ভিল্লিয়ার্স উপস্থিত থাকিলে—নিশ্চয়ই তিনি মেরিয়াসের উদ্ধারের জন্ম কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন? এই পথ দিয়া—বা ওয়াটারলুর সাঁকো পার হইয়া তিনি প্রত্যহ প্রাতে রয়েল ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে মহলা দিবার জন্ম যাইয়া থাকেন! কিন্তু—মেরিয়াসের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের কথা শুনিয়া অবধি তাঁহার দেহ মন যেন একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে! তিনি শরীরে অসুস্থতা নিবন্ধন আজ সপ্তাহ যাবৎ থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন।

মেরিয়াসের এখনও দিন ফুরায় নাই—সুতরাং তাহার মৃত্যু হইবে

কেন? তাহাকে নদীগর্ভে ডুবিতে দেখিয়া—তীরস্থ জন-সঙ্ঘের ভিতর হইতে একজন নীচ জাতীয় ব্যক্তি, যেন জগদীশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া—তাড়াতাড়ী নিজের জামা টুপী খুলিয়া সেই ভীষণ নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া অদৃশ্য হইল; পরমুহূর্ত্তেই সে ব্যক্তি জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। কূলের সমস্ত লোক তাহাকে দেখিয়া মহোল্লাসে চীৎকার করিল; তাহার সাহসিকতার প্রসংশা করিতে লাগিল।

সে ব্যক্তি নদীস্রোতের সহিত কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া যেন আত্মরক্ষার কতকটা সুরাহা করিয়া লইল। কৌশলে সাঁতার দিতে দিতে সে নদীর চারিধারে চাহিয়া যেন মেরিয়াসের অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়—তাহার নিকট হইতে দুই হস্ত দূরে কাহার যেন কেশগুচ্ছ দেখা গেল। দর্শকগণ উহা মেরিয়াসের কেশরাশি বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঐ—ঐ—ধর—ধর!"

সেই ব্যক্তি দ্রুতহস্ত পদ সঞ্চালনে সেই কেশ-গুচ্ছ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে ধরিতে গেল কিন্তু হায়—ধরিয়াও ধরিতে পারিল না! লক্ষ্য বস্তু অদৃশ্য হইল! সেও সঙ্গে সঙ্গে—সন্তরণ করিতে করিতে নদীগর্ভে পুনরায় প্রবেশ করিল।

কতক্ষণ—কতক্ষণ অতিবাহিত হইল তথাপি কাহারও দেখা নাই! দর্শকগণ সকলেই মেরিয়াস ও তাহার উদ্ধারকর্ত্তার মৃত্যু নিশ্চিত ভাবিয়া, হতাশে বিষম দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জয় জগদীশ্বর! ঐ সেই ব্যক্তি অচৈতন্য মেরিয়াসের দেহলতা স্কন্ধে করিয়া জলের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিয়াছে! দর্শকগণ দেখিলেন—অপূর্ব্ব কৌশলে সে সাঁতার দিয়া তীরাভিমুখে আসিতেছে। নদী তীর তাহার নিকট হইতে বহুদূর নহে—তথাপি বহু চেষ্টায়ও সে কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না! বিষম বিপরীত স্রোত তাহাকে কোন

মস্তেই কূলে আসিতে দিতেছে না! উপরন্তু তাহার স্কন্ধে একটা বোঝা!

হতাশ হইয়া সেই বীরপুরুষ তখন দর্শকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! আর পারিব না!" যথার্থই তখন তাহার প্রাণ যায়—কিন্তু তথাপি সে মেরিয়াসকে পরিত্যাগ করে নাই; তখনও সে প্রাণপণে শেষ প্রাণনাশী প্রবল তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতেছে! ক্রমে তাহার হাত পা অবসন্ন হইয়া পড়িল তথাপি সে সাঁতার দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে! এইরূপে বহুক্ষণ সাঁতার দিবার পর প্রায় তীরের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। এইবার বীরপুরুষ কৌশলে মেরিয়াসকে ধরিয়া তীরের দিকে জোরে ছুঁড়িয়া দিল এবং নিজে তাহার দিকে সাঁতার দিয়া যাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না! হতভাগ্য ভীষণ চীৎকার করিয়া ডুবিয়া গেল!

তীর হইতে অর্দ্ধহস্ত দূরে মেরিয়াসকে পতিত দেখিয়া একজন যুবক তীরে দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া মেরিয়াসের পোষাক ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইল। ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি একখানি নৌকা সেই বীরপুরুষের উদ্ধারের জন্য প্রেরিত হইল—কিন্তু হায়-সকলই নিষ্ফল হইল! বহু অন্বেষণের পর যখন তাহাকে উদ্ধার করা হইল তখন তাহার দেহ প্রাণশূন্য হইয়াছে!

এ সংসারে দাতার অভাব নাই! অগাধ সম্পত্তিশালী ধনী ব্যক্তি দুই পাঁচ টাকা দান করিয়া—সমুদ্র হইতে দুই চারি গণ্ডূষ জল লইয়া মরুভূমিতে ছড়াইয়া আপনাকে দাতা ও পুণ্যবান ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া থাকেন! মনে ভাবেন—স্বর্গরাজ্য তাঁহার করতলগত! কিন্তু এই নীচ জাতীয় দীন দরিদ্র ব্যক্তি পরের প্রাণ-রক্ষার্থে যে অকাতরে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিল—করুণাময় জগদীশ্বর! এই হীন ব্যক্তির জন্য তুমি কোন্ স্বর্গ নির্দ্দেশ করিয়াছ?

দর্শকবৃন্দের ভিতর হইতে কয়েকজন পুলিশের সাহায্যে তাড়াতাড়ী মেরিয়াসকে নিকটস্থ এক কারখানা বাটীতে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মেরিয়াসের চৈতন্য লাভ হইল এবং এক গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিয়া অভাগিনী একটু সুস্থ হইল।

মেরিয়াস প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই কারখানার অধিকারী নিকট আপনার অবস্থার বিষয় অকপটে সমস্ত জ্ঞাপন করিল কিন্তু তাহার নাম ধাম সঠিক কিছুই প্রকাশ করিল না। তাহার প্রথম চিন্তা কেমন করিয়া জর্জ্জ ভিল্লিয়াসে'র নিকট সমাচার প্রেরণ করিবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে জর্জ্জ ভিল্লিয়ার্স, ব্ল্যাক্‌ আইভিসের সেই উদ্যান বাটীতে মেরিয়াসের সন্ধান লইতে আসিয়াছিলেন—ঠিক তাহার পরদিন প্রভাতে তথায় মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। উদ্যানবাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকজন তথায় আসিয়া মিঃ স্মিথের হত্যার ব্যাপার লইয়া জল্পনা করিয়া বিষম গোলযোগ করিতে লাগিল। নানা লোকে নানা মত প্রকাশ করিতে লাগিল—কিন্তু কে যে হত্যা করিল সে সম্বন্ধে কিছুই স্থির হইল না! ভয়ে ও বিস্ময়ে উদ্যানরক্ষকের মুখ শুখাইয়া গেল; লোকজন সঙ্গে লইয়া সে তখন উদ্যানবাটীর চারিদিক তল্লাস করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কোনও ফললাভ হইল না। কেবল স্থানে স্থানে মনুষ্যের যাতায়াতের পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল—হত্যাকারী বিস্তর লোকজন সঙ্গে আনিয়াছিল এবং মিঃ স্মিথ আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকারীদিগের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

উদ্যানের একপার্শ্বে ঘাসের উপর খুব খানিকটা রক্ত জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—সকলে দেখিতে পাইল—এবং তাহারই সন্নিকটে

মিঃ স্মিথের পোষা কুক্কুরটী মৃতাবস্থায় পতিত। কেহ কেহ বলিল—"এ নিশ্চয় ডাকাতদিগের কায!" দলবল আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল একস্থানে একটী স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র উদ্যানরক্ষক তাহা তুলিয়া লইল এবং মহানন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আর যায় কোথা! এইবার খুনী ধরবার উপায় হয়েছে;—এই জিনিষের জোরেই তাকে নিশ্চয় গ্রেপ্তার ক'র্ব্ব!" সকলেরই মুখে উল্লাসের চিহ্ন, যেন হত্যাকারী স্বয়ং আসিয়া ধরা দিয়াছে!

উদ্যানস্থ সকলে যখন এইরূপে আপনাআপনি গোলমাল করিতেছিল সেই সময় জনতা ভেদ করিয়া একটী বৃদ্ধা আসিয়া উদ্যানরক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এ গায়ের কাপড় কোথা পেলে বাছা?" উদ্যানরক্ষক আদ্যোপান্ত তাহার নিকট বিবৃত করিল; শুনিয়া বৃদ্ধা বলিল "এখন নিশ্চয় সেই মেয়েটারী কাজ! মিঃ স্মিথ্ যখন তাকে এ বাগানে নিয়ে আসে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি এ গায়ের কাপড় তারই গায়ে ছিল! শুধু কি তাই? দাঙ্গা হ্যাঙ্গামের পর সে মেয়েটা যখন এখানে থেকে পালায় তখনও আমি দেখিতেছি তার গায়ে এ কাপড়টা তখন ছিল না সে খালী গায়ে পালাচ্ছে! আমি নিজের চক্ষে সমস্ত ব্যাপার দাঁড়িয়ে দেখেছি! তবে বড় লোকের কাণ্ড,—আমি গরীব লোক,—আমি তাতে কেন কথা কহিতে যাব! মনে কল্লুম-বুঝি সকলে মদ খেয়ে মাতলামি ক'চ্ছে আরে ছাই—আমি কি জানি ছুঁড়ী পালাচ্ছে? তা'হলে তখনি তার পেছনে লোক লাগিয়া দিতুম;—নিদেন আমার বড় কুকুর বিলিকে লেলিয়ে দিতুম! বৃদ্ধার কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিল। উদ্যান রক্ষক দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ লণ্ডনের পুলিশে পত্র লিখিয়া লোক পাঠাইয়া দিল। পত্রে বিশেষ করিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে অনুরোধ করিল—যেন ঘটনাস্থলে একজন

গুপ্ত গোয়েন্দাকে প্রেরণ করা হয়। লোক পাঠাইয়া উদ্যান রক্ষক নিজ প্রভুর মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া পুলিশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে লণ্ডনের পুলিশ হইতে মিঃ জিল্‌বার্ট হক্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গোয়েন্দা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হত্যাসম্বন্ধীয় যথাসম্ভব তদারক করিয়া উপস্থিত লোক জনের এজাহার লইয়া কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

গোয়েন্দা মহাশয় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন,—মিঃ স্মিথ মেরিয়াসকে নাট্যশালা হইতে কৌশলে হরণ করিয়া ব্ল্যাক আইভিসের উদ্যান বাটীতে আনিয়াছে; কিন্তু এখান হইতে সে গেল কোথায়? এবং মিঃ স্মিথকে হত্যাই বা কে করিল! গুরুতর সমস্যার বিষয় বটে! গম্ভীর হইয়া মিঃ হক্ ভাবিতে লাগিলেন—"মেরিয়াস ঠিক উপন্যাসের একটী নায়িকা! একটা না একটা বিভ্রাট তাহার লাগিয়াই আছে! আরও দেখি—যত ফাঁসাদ তার পরের সঙ্গে! কিন্তু আমার তো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মেরিয়াসের কোনরূপ সংস্রব আছে! যদি আমি তাহাকে পূর্ব্ব হইতে না চিনিতাম তাহা হইলে হয়ত এই অবস্থায় তাহাকেই হত্যাকারিণী বলিয়া আমার সন্দেহ হইত! কিন্তু আমি তাহার চরিত্র বিশেষ রকমই জানি।" মিঃ স্মিথের মৃতদেহ দেখিয়া সুচতুর গোয়েন্দা মহাশয় স্থির করিলেন—শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় কারণ মিঃ স্মিথের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এ যে ঘরে হত্যাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে—ভিতর হইতে তাহার দ্বার অর্গল বদ্ধ। হত্যাকারী নিশ্চয়ই জানালার ভিতর দিয়া গৃহ মধ্যে যাতায়ত করিয়াছে। অনুসন্ধানে আরও জানা গেল—মিঃ স্মিথের পকেট হইতে টাকাকড়ী অঙ্গ হইতে সোণার চেইন্ ঘড়ী হীরার আংটী প্রভৃতি সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

৩৭৬

বঙ্গসাহিত্যে নাটক।

(শ্রীরাখাল দাস কব্যানন্দ লিখিত)

"রসাত্মকং বাক্য কাব্যম্" অলঙ্কার কাব্যের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করে। যে কোন কথায় রস থাকে তাহাই কাব্য। অলঙ্কারের এই সংক্ষিপ্ত সজ্ঞা অতি সমীচান। বাস্তবিক একটা সামান্য কথায় যদি হাসি পায় তবে সে কথাটাও কাব্য মধ্যে গণনীয়। তবে বৃহৎ কাব্যে না হউক, অতিনগন্য ক্ষুদ্র কাব্যও তাহাকে বলিতে হইবে। নতুবা অলঙ্কারের সংজ্ঞার দোষ পড়ে। দেশীয় অলঙ্কার অতি সংক্ষেপে কাব্যের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা প্রকৃতই অতি অভাবনীয় ব্যাপার। অলঙ্কার যথার্থ ই থালীর মধ্যে হাতী পুরিয়াছে। অলঙ্কারকে উড়াইবার উপায় একেবারেই নাই।

অলঙ্কারের এই লক্ষণ অনুসারে নাটকই শ্রেষ্ট কাব্য। নাটকই শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। নাটকে যত রসের সমাবেশ, যত রসের উচ্চতম উচ্ছাস, কাব্যের আর কোন অংশে, কোন অঙ্গ এতো নয়। তাই নাটক কাব্যক্ষেত্রে অতি মহান ব্যাপার মনুমেণ্ট বিশেষ। নাটকই কাব্যরাজ্যের মহারাজাধীরাজ।

যে দেশে যে যুগে যখনই কাব্যের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে—তথায় তখনই নাটকের বিশেষ বিকাশ সংসাধিত হইয়াছে। অথবা অন্য কথায় ইহাও বলা চলে, যে নাট্যাঙ্গের বিকাশ সূত্র ধরিয়াই যুগ বিশেষে বা দেশ বিশেষে কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। সার্নে৷ সেক্সপিয়ার গেটে শিলার ভবভূতি কালিদাসের নাটক তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য আলঙ্কারিক কবি সেই দৃশ্য কাব্যের সমালোচনায় বলিয়াছেন "Imagination, Teeming with action and

character makes the greatest poets ; feeling and thought the next ; fancy (by itself) the next ; wit the last." কাব্যব্যাখ্যায় এ লক্ষণে সকলের সম্মতি না থাকিলেও উল্লিখিত কথায় যে সুক্ষ্ম সত্য নিহিত আছে তাহা অনেককেই মুক্তকণ্ঠে মানিতে হইবে। বাস্তবিক কল্পনা ক্ষেত্রে ঘটনা বৈচিত্র্য ও চরিত্র সমাবেশ ঘটিলেই কবিত্বের চরম অভিব্যক্তি বিকশিত হয়। এখন অভিব্যক্তির সুবর্ণ সাম্রাজ্য নাটক ভিন্ন আর কোথায় ? এই সুবর্ণ সাম্রাজ্যের সম্রাট নাটককার ভিন্ন অন্য কবিই বা আর কে ? খণ্ড কাব্য (Epic) অবশ্য কাব্য রাজ্যের অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু সে শ্রেষ্ঠ স্থান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর স্থান নটকের অধিকারভুক্ত। তাই খণ্ড কাব্যের কবি—মহাকবি হোমার, সেক্সপিয়ারের পরবর্ত্তী আসন লাভ করিয়াছেন।

খণ্ড কাব্য (Epic) বড়। কেন বড় ? আমি মনে করি এপিক তাহার নাট্য অঙ্গ লইয়াই বড়। নাট্য অঙ্গ বাদ দিলে বিশাল বিরাট এপিকও অতি হীন হইয়া পড়ে। এপিক-রাজ্যের রাজাধিরাজ "রামায়ণ, মহাভারত" হইতে যদি ভাব-রস সমন্বিত সৌন্দর্য্য-শোভিত নাট্য-অঙ্গ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের অন্তরস্থ সুধার সাগর শুখাইয়া যায়। তাহারা অতি হীন, ক্ষীণ সামান্য ইতিবৃত্তে পরিণত হইয়া পড়ে। প্রাচীন পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হোমার। "ইলিয়েড" সেই শ্রেষ্ঠ কবির এক শ্রেষ্ঠ কাব্য। "ইলিয়েড" খণ্ড কাব্য। প্রতীচ্য খণ্ড কাব্যের মধ্যে "ইলিয়েড" অতি মহৎ কাব্য। সৃষ্টি চাতুর্য্য (invention) লইয়াই হোমার বড়—হোমার বিখ্যাত। বিশ্ববিক্রুত হোমারের বিশ্ববিশ্রুত ইলিয়েডে সৃষ্টি চাতুর্য্যের ছড়াছড়ি। তাই মহাকবির মহাকাব্য "ইলিয়েড" অতি শ্রেষ্ঠ—অতি মহান। গবেষণা বিচার বুদ্ধিতে হোমারের সহিত ভার্জ্জিলের প্রতিদ্বন্দীতা চলিতে

পারে, কিন্তু সৃজন কৌশল কলায় হোমার অবিসম্পাদিতরূপে অনেকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হোমারকে কর অনেক কবিকেই দিতে হয়। হোমার সত্যই পাশ্চাত্য কবিকুলের এক্ রাজাধিরাজ। কেবল সৃজন কৌশল কলারই বলেই এত বড়। সৃজন কৌশলই কবিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান—তাহাই কবিত্বের জান। সূক্ষ্মদর্শী ইংরাজ কবি পোপ সত্যই বলিয়াছেন 'whatever praises may be given to works of judgment, there is not even a single beauty in them but is owing to the invention.' বাস্তবিক সৃজন কৌশলে অপূর্ব্বতা নবীনতা; অপূর্ব্বতা নবীনতায় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত।

প্রকৃত কবির প্রসূতি প্রকৃতি। প্রকৃতির পীযূষধারা হইতেই কবি আত্ম-পুষ্টি, আত্ম-অভিব্যক্তি সাধন করেন। প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার সামগ্রী মানব—প্রকৃতির পূর্ণ লীলা প্রকটিত মানব চরিত্রে। মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম রেখা সন্দর্শন—সে রেখার ব্যবচ্ছেদ বিশ্লেষণ—তাহার বিশেষত্ব প্রদর্শন, শ্রেষ্ঠ কবির অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। এই কর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি নাটকে; তাহার শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত নাটককার। তাই নাটক কাব্যকলার মহৎ অঙ্গ; আর নাটককার কবিকুলের অত্যুজ্জ্বল শিরোমণি। নাটককারের কবিত্ব কৃতিত্ব আরও এক বিশেষ বিভাগে বিকশিত। নাটককার কেবল কবি নহেন; দার্শনিকের অধিকারেও তাঁহাকে অধিক অংশে আধিপত্য করিতে হয়। নাটককারকে মানব চরিত্র চিত্রন করিতে হয়—মানবের মন লইয়া গড়া-পেটা করিতে হয়। নাটককারের এই সূক্ষ্ম কর্ম্মাঙ্গ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির বাহিরে অবস্থিত —কল্পনা রাজ্যের বহির্ভূত। ইহা মনোবিজ্ঞানের (Psychology) অধিকার ভুক্ত। সুতরাং সূক্ষ্মদর্শী নাটককারকে মনোবিজ্ঞানের অধিকারে প্রবেশ করিতে হয়। মনোবিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া দার্শনিকের পদবী লাভ করিতে হয়। যে নাটককার এই উভয় সম্পদে

ঐশ্বর্য্যবান—যিনি কবিকল্পনাসম্ভূত সৌন্দর্য্য সৃজন শক্তির সহিত মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিজ্ঞানের অধিকার লাভ করেন, তাঁহারই নাট্য-কলা পূর্ণাঙ্গে প্রকটিত হয়। সেই কৃতী কবি কাব্য কাননের সার সম্পদ সংগ্রহ করিয়া সারস্বত কুঞ্জের সুশোভন উপহার উপাদানে বিশ্ব ব্যাপারের বৈচিত্র্য বিধান করেন। সেই নাটককারের নাট্য-কলা-কৌশলে পরিতৃপ্ত মানব সমাজ সত্যই স্বর্গসুধায় পরিপ্লুত হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই দরিদ্র বঙ্গ সাহিত্যে তেমন কয় জন অমর কবি আবির্ভূত হইয়াছেন? নাটুকে রাম নারায়ণ হইতে মধুসূদন দীনবন্ধু মনোমোহন গিরীশচন্দ্র, পর্য্যন্ত যে কয়জন নাটককার আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এই স্বর্গীয় শক্তি সম্পদে সৌভাগ্যবান? ইহা অতি সূক্ষ্ম সমালোচনার কথা। আমরাও সূক্ষ্মভাবে এই আলোচনার প্রয়াস পাইব।

মেহের-উল্-নিসা।

(শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রালোকে, আগরা-দুর্গের লোহিত ও সমুন্নত প্রস্তর প্রাকার রজতস্রোত-বিপ্লাবিত। তোরণ দ্বার সমূহ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। রাত্রি দ্বিপ্রহরের নহবৎ থামিয়া গিয়াছে। সেই গভীর নিশীথে দুর্গের নানা-স্থানে উন্মুক্ত কৃপাণ ও বর্শা হস্তে মোগল ও রাজপুত প্রহরীগণ বিনিদ্রনেত্রে পাহারা দিতেছে। আকবরসাহ নেপোলিয়ান অপেক্ষাও সুচতুর, সুদূরদর্শী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও শৃঙ্খলার সমর্থনকারী। এইজন্য,

সেই নৈশ-সমীরণ-চালিত, শ্যামল বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-ধ্বনিকে পদশব্দ মনে করিয়া প্রহরীরা এক একবার সতর্ক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতেছিল—“কে যায়?”

এই ত গেল দুর্গের বাহির প্রাঙ্গণের অবস্থা। প্রথম প্রাঙ্গণ পার হইয়া কিছু দূর গেলে রাজপুরী। রাজপুরীর সীমাসংলগ্ন মতি-মস্‌জেদ, দেওয়ান-খাস ও আম-দরবার প্রভৃতি প্রাসাদের, গগনস্পর্শী মিনারগুলি সেই গম্ভীর নিশাকালে সুবিমল রজত-স্রোত-বিধৌত হইয়া যেন অমরার সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছিল।

এলা-লতার ফুল ফুটিয়াছে। লবঙ্গ-লতা ক্ষুদ্র মুকুল বক্ষে লইয়া ধীর-সমীরে সঞ্চালিত। পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডের এক অংশে আম্রাণ বৃক্ষের হরিদ্রাবর্ণ কুসুমরাজির উপর, চন্দ্রালোক পড়িয়াছে। মলয়-চালিত আম্রাণের সুগন্ধে দিগবলয় কি যেন এক অপূর্ব্ব মধুর সুগন্ধে আমোদিত হইতেছিল। ইহার পরেই খোস্‌বাগ। খোস্‌বাগের পর হইতেই রঙ্গমহাল আরম্ভ।

খোস্‌বাগ—বাদসাহের সাধের নন্দন কানন। এখানে নাই কি? বেলা, মল্লিকা, নাগকেশর, চম্পক, গন্ধরাজ, চামেলি, গন্ধসার, হেনা, মতিয়া আর কতই বা নাম করিব—ফুলের সেরা, ফুলের রাজারাণী যারা, তাহারা সেই উদ্যান ক্ষেত্র আলো করিয়া, সেই বিমল চন্দ্রালোকের পবিত্র উজ্জ্বলতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল।

আর মলয়! সে আজন্ম চোর! ফুলের বাস চুরী করাই তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সেই অপহৃত সুবাসবাসে বিরহিণীর দীর্ণ-হৃদয় বিদীর্ণ করাই, তাহার চিরাভ্যসেবিত কর্ত্তব্য। মিলন সুখসম্ভোগ প্রমত্ত-বিলাসানন্দ-বিভোর-হৃদয়া, উল্লাসপরিপ্লুতা প্রেমিক-প্রেমিকার প্রাণে বিমলানন্দ প্রদান করাও তার আর এক নষ্টামি। এক্ষেত্রে কিন্তু মলয় এক মহাসমস্যার মধ্যে পড়িয়াছিল। রাশিকৃত সুগন্ধি-সম্ভার

নৈশ-কুসুমের মধ্যে, কে শ্রেষ্ঠ ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, মিশ্র সুগন্ধি-রাশি বুকে লইয়া, সে অতি চঞ্চল ভাবে, চারিদিকে ঘুরিতে ফিরিতেছিল, আর রঙমহালের মণিখচিত কক্ষসমূহের মর্ম্মর বাতায়নের মধ্য দিয়া নিজের সূক্ষ্মকায় প্রবেশিত করিয়া মানবিমোহিতা, অভিমান-বিক্ষুব্ধা, উপেক্ষিতা, প্রোষিত ভর্তৃকান্তের দীর্ঘশ্বাস ব্যাকুলিত নাসারন্ধ্রের নিকট—সেই সুগন্ধি রাশি ধরিয়া তিরস্কৃত হইতেছিল!

এই খোস্-বাগের নানা স্থানে কৃত্রিম প্রস্রবণ। নৈসর্গিক শোভা সম্পদ ভূষিতা, সুধাংশুকরপ্লাবিতা, নিশীথে অদ্ভুত যন্ত্রনিয়মসম্বদ্ধ—সেই রজত-খচিত, মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রস্রবণ সমূহের গাত্র হইতে, প্রচুর সলিল-রাশি—উর্দ্ধে অধঃ—পার্শ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, শীতল মলয়কে সুশীতল শীকর সম্পৃক্ত করিতেছিল। সেই সলিল রাশির উপর বিমল চন্দ্রকিরণ নিপতিত হওয়ায় বোধ হইতেছিল, যেন চূর্ণীকৃত অতি সূক্ষ্ম তুষারকণা এক অজানিত শক্তিবলে চারিদিকে উজ্জল মুক্তাধারা বর্ষণ করিতেছে।

বাহিরের এই মোহকরী শোভা। কিন্তু রঙমহলের অন্দরের পথে ইহার সম্পূর্ণ অভাব। অন্দরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলিপথে, ভীমকায়া তাতারীরা সমরখন্দের উৎকৃষ্ট ইস্পাত নির্ম্মিত সুশাণিত ছুরিকা হস্তে, ইতঃস্তত পাহারা দিতেছে। সেই স্থান দিয়া মক্ষিকারও অবাধগমন সম্ভবপর নহে। একটা আশ্চর্য্যের কথা এই—প্রহরীরা সকলেই নিদ্রালস-বিহীন-নেত্রে সতর্ক, কর্ত্তব্যপরায়ণ। সবই সেই তীক্ষ্ণদর্শী গৌরবান্বিত সম্রাট-শ্রেষ্ঠ আকবরের সুব্যবস্থায়। সকলেই জানিত, সম্রাট গভীর নিশীথে গুপ্তভাবে সহসা পুরীর বাহির হইয়া, তাঁহার রক্ষী-সেনাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় লইয়া থাকেন। কাজেই সকলেই সতর্ক—সকলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ।

আকবরসাহ নিজের শক্তিতে, নিজের বাহুবলে, নিজের বুদ্ধিতে

এই বিশাল হিন্দুস্থানের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। অমর কোটের মরুভূমি মধ্যে, তাঁহার পিতার অতি দুরবস্থার সময় তাঁহার জন্ম। অত বড় বাদসা হুমায়ুন—তখন শত্রুতাড়িত, সিংহাসনচ্যুত। তাঁহার অবস্থা তখন এত হীন—তখন তিনি এত দরিদ্র—যে পুত্রের জন্মোৎসবের স্মৃতি-রক্ষার জন্ম, কয়েকটি দানা মাত্র মৃগনাভি তাঁহার সেই বিপৎকাল সহচর, অনন্ত বিশ্বাসী, দুর্দ্দশার সহায়, ওমরাহ ও সেনাপতিগণকে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ভাগ্য-বিতাড়িত সম্রাটের তখন এত হীনাবস্থা যে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী, আকবর জননী, হামিদা-বানু বেগম, পূর্ণগর্ভাবস্থায় খণ্ডমাত্র হরিণমাংস, দোহদরূপে প্রার্থনা করিলেও তিনি সে সামান্ত অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই ভাগ্যবিতাড়িত, সাম্রাজ্যচ্যুত, শত্রুভয়কাতর প্রাণ, হুমায়ুন বাদসাহের মরু প্রান্তরে জাত সুকুমার, এখন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" নামে সমগ্র ভারতে পরিকীর্ত্তিত।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া আকবর কিরূপে কূটকৌশলী আধিপত্য-প্রয়াসী বৈরামখাঁর অধীনতা বিমুক্ত হন—কি করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, ইতিহাস পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত নহে। সে সব অতীত ঘটনার পুনরুল্লেখ এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক।

এতকথা বলিবার তাৎপর্য্য এই,যে আকবর সাহ সুকুমার কিশোর-কাল হইতে বার্দ্ধক্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই নিজের চক্ষে দেখিতেন। তিনি হিন্দুদিগকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু স্বজাতির উপর তাঁহার বিশ্বাস যেন অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তিনি অনেক হিন্দুকে সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজস্ব-সচিব রাজা টোডরমল্ল ও তাঁহার প্রধান সেনাপতি মানসিংহই তাহার নিদর্শন।

আকবর সাহ রাজ্যের সমস্ত কার্য্য যেমন নিজের চক্ষে দেখিয়া শুনিয়া করিতেন, তাঁহার অন্তঃপুরের সকল কার্য্য সেইরূপ তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধীন ছিল।

অনেক সময় তিনি ছদ্মবেশে সামান্ত পরিচ্ছদে, গভীর নিশীথে নিদ্রাসুখবিরহিত হইয়া, রঙ্গমহালের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কখনও বা মুসাফেরবেশে রাজধানীর নানাস্থানে প্রজার প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্ত একমাত্র বিশ্বাসী অমাত্য মহারাজ বীরবলকে সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করিতেন। তবে কোন সময়ে তিনি কি ভাবে কাজ করিতেন তাহার কোন কিছু স্থিরতা ছিল না।

রজনী দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ। রঙ্গমহালের অনেকগুলি মণিখচিত প্রকোষ্ঠের, উজ্জ্বল আলোকমালা বহু পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত। কিন্তু এখনও দুই একটি কক্ষ, উজ্জ্বল দীপরাজিতে উজ্জলিত। তখনও শ্রান্ত রজনীর পরিশ্রান্ত বিলাসের, সামান্ত চিহ্ন স্বরূপ দুই একটী কক্ষ হইতে মৃদু সংগীত-ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। কোন সুরূপসী হয়তঃ বাদসাহের আগমন প্রত্যাশায়, বহুক্ষণ আশা-আনন্দপূর্ণ চিত্তে জাগিয়া থাকিয়া শেষ তাঁহার অনাগমনজনিত বিরহ-ব্যথায় জর্জ্জরিত হইয়া,নিরাশ প্রাণে মৃদুস্বরে বিরহ সঙ্গীত গাহিতেছিলেন—আর প্রতিধ্বনি অনেক কষ্টে তাঁহার আবেগ বিকম্পিত, অস্ফুট সুররাজি বুকের ভিতর লুকাইয়া লইয়া বাহিরের সুগন্ধ মলয়কে উপহার দিতেছিল।

খোস্‌বাগের উত্তরদিকের মহলগুলি সম্রাটের অন্তঃপুর। পূর্ব্ব-দিকের মহলগুলি সাহাজাদাদের মহল। সজ্জাগৌরবে, স্থাপত্য-গর্ব্বে কোন মহলই হীন নহে।

এই গভীর নিশীথে, অভাগিনী জুলিয়া বিনিদ্র-নেত্র। সে একখানি কৃষ্ণবর্ণ স্থূলবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, সাহাজাদার অধিকৃত মহলের পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইল। তাহার হৃদয় ভীতি-বিকম্পিত, গতি সন্ত্রস্ত

ও সংযমিত। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সে ভয়চকিত নেত্রে, ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। যুবরাজ সেলিমের প্রদত্ত প্রেমপত্র-খানি আঙ্গরাখার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, সে এই গভীরা নিশিতে যুবরাজের প্রেমলীলার গুপ্ত দূতীরূপে চলিয়াছে।

জুলিয়া সাহাজাদার মহল পার হইয়া বাদসাহী-মহলে প্রবেশ করিল। এমন সময়ে প্রহরী কঠোর কণ্ঠে হাঁকিল—"কে যায়?"

"আমি জুলিয়া বাঁদী।"

"এ রাত্রে কোথায় যাইতেছ?"

"সাহাজাদার কাজে!"

"পাঞ্জা আছে?"

"আছে—"

সেই প্রশ্নকারী আর কেহই নহে—এক তাতারণী। তাতারণী নিকটে আসিয়া জুলিয়ার পাঞ্জা দেখিল। তারপর বলিল—"ফিরবে কখন?"

"এক ঘণ্টার মধ্যে।"

"একাকিনী রাজপথে যাইবে কি করিয়া?"

"সাহজাদার আদেশে দুর্গদ্বারে আমার সহায়তার জন্য রক্ষী নিযুক্ত হইয়াছে।"

"যাও" বলিয়া সেই ভীমকায়া তাতারণী অন্য পথে চলিয়া গেল।

জুলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে সাহাজাদার বাঁদীরূপে নিযুক্ত হইবার পর, আর কখনও গভীর রাত্রে মহলের বাহিরে আসে নাই। মহলের মধ্যে যে এত কঠোর পাহারা, তাহাও সে জানিত না।

জুলিয়া সেই খোস্‌বাগের পার্শ্বস্থিত প্রস্তরময় পথ ধরিয়া রঙ্গ-মহালের প্রবেশ দ্বারের কাছে আসিল। এই প্রবেশ দ্বারে, প্রহরী নাই—কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শুভ্র বসনাবৃত সুগঠিতকায় এক ব্যক্তি সেই

দ্বারপথের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ধীরভাবে সেই স্থানে পদচারণা করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, তিনি যেন কাহারও জন্য সেই প্রবেশদ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতেছেন।

বাঁদী সেই শুভ্র পরিচ্ছদাবৃত দেহ দেখিয়া, ভয়ে ক্ষীণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই নিশাবিহারী পুরুষও, রমণীকণ্ঠনিঃসৃত এই অস্ফুট চীৎকারে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"কে তুই ?"

প্রফুল্ল জ্যোৎস্নালোকে সেই ছদ্ম-বেশাবৃত মূর্ত্তি দেখিয়া জুলিয়া তখনই চিনিতে পারিল—স্বয়ং বাদসাহ তাহার সম্মুখে। সে যে কি বলিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

বাদসাহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"কে তুই! এতরাত্রে প্রচ্ছন্নভাবে শরীর ঢাকিয়া, কোথায় যাইতেছিস্ ?"

জুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাদসাহের চরণ-প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া বস্ত্রাগ্রভাগ চুম্বন করিয়া বলিল—"এ বাঁদী, হজরত সাহজাদার সেবিকা।"

বাদসাহ প্রশ্ন করিলেন—"তোর নাম ?"

"জুলিয়া।"

"এত রাত্রে—এ বেশে কোথায় যাইতেছিলি ?"

"সহরের মধ্যে একটু প্রয়োজন আছে।"

"মহল পার হইলি কিরূপে ?"

"জনাবালি পাঞ্জা দিয়াছেন।"

"কই সে পাঞ্জা ?"

জুলিয়া কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিত হস্তে, সেই পাঞ্জাখানি বাদসাহের হাতে দিল। বাদসাহ তাহা জুলিয়াকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"তোর এ রাত্রে বাহিরে যাইবার কারণ কি ?"

"বলিতে নিষেধ। সাহান্-সা, আমি হুকুমের বাঁদী—"

"কার হুকুমের বাঁদী—"

"সাহাজাদার—ভবিষ্যৎ ভারতসম্রাট—সুলতান সেলিমের।"

"বটে! যতক্ষণ না তুই সমস্ত কথা সত্য বলিবি, ততক্ষণ বাহিরে যাইতে পারিবি না।"

"এখনও বিশ্বাসহন্ত্রী হই নাই। সাহান-সা! বাঁদীর বাঁদীকে মার্জ্জনা করুন।"

বাদসাহ তখনিই বক্ষ-মধ্যস্থ বস্ত্র হইতে একটী ক্ষুদ্র বংশী বাহির করিয়া তদ্বারা সঙ্কেতধ্বনি করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে, আটজন সশস্ত্র, ভীমকায় তাতারী-প্রহরী সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কুর্ণীস করিল।

বাদসাহ তাহাদের প্রধানাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"জুমিয়া! এই স্ত্রীলোক বড় বেয়াদব! এত সাহস এর, যে আমার হুকুম অমান্ত করিতে চায়! তোরা ইহাকে, ঐ বৃক্ষান্তরালে লইয়া যা। ইহার বস্ত্র মধ্যে যদি কোন কিছু পাস্—আমায় এখনি আনিয়া দে।"

প্রহরীরা তখনই জুলিয়ার হাত ধরিয়া সেই নির্দ্দেশিত বৃক্ষের দিকে চলিল। তাহাদের কঠিন হস্তের চাপনে জুলিয়া বড়ই যাতনা পাইল। তাহাদের সবল আকর্ষণে সে বুঝিল—তাহার রক্ষার আর উপায় নাই।

সে মনে ভাবিল—"হায়! কেন তখনই সব কথা খুলিয়া বলিলাম না। আমার বক্ষবস্ত্র অনুসন্ধান করিলেই যে ইহারা সেই পত্রখানি পাইবে।"

আবার সে দুই মুহূর্ত্ত ধরিয়া কি ভাবিল। তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। যে মুখ—একটু আগে ভয়ক্লিষ্ট দেখাইতেছিল, তাহা যেন ঈষৎ-হাস্তরস মুখরিত হইল।

জুলিয়া কি উন্মাদিনী! সত্যই কি সে আসন্ন-বিপদ-জ্ঞান-রহিতা! সত্যই কি সে ভীষণ ভবিষ্যৎজ্ঞান পরিশূন্যা। তাহার মনে তখন এক নূতন কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছে। সে সেলিমের উপর প্রতিহিংসা

লইবার জন্যই, এই বাঁদীগিরী স্বীকার করিয়াছে। এতদিন তাহার কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। আজ সহসা সে সুযোগ আপনিই উপস্থিত। এজন্য সে প্রসন্ন চিত্তে তাহাদের সহিত সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল।

তাহার বক্ষবস্ত্র মধ্যে অনুসন্ধান করিবামাত্রই—জুনিয়া, একখানি লোহিতবর্ণ পত্র পাইল। সেখানি হস্তগত করিবার পর, সে পরুষকণ্ঠে বলিল—"বাঁদী! তোর কি মৃত্যুভয় নাই। আর কি আছে, শীঘ্র বাহির করিয়া দে।"

জুনিয়া তখন আঙ্গরাখার আর একটী গুপ্ত স্থান হইতে, এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মুক্তাহার বাহির করিল। সেই মুক্তাহার-সংলগ্ন শুভ হীরকখানি চন্দ্রালোক-খচিত হইয়া অতি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে লাগিল।

তাতারী জুমিয়া তখন ভীমস্বরে বলিল—"আর কিছু নাই।"

জুনিয়া বলিল—"খোদার কসম্! সত্য কথা বলিতেছি। যাহা ছিল তাহা তোমরা লইয়াছ। এখন বাকী আছে এ জীবন। তাহাও সাহান-সার আদেশে এখনি শেষ হইবে।"

জুমিয়া বাঁদী—খর্ব্বকায়া, কৃষ্ণবর্ণা, ভীষণ ভ্রুকুটি-ভঙ্গীময়ী। তাহার মুখে চোখে যেন কত নিষ্ঠুরতা মাখানো। তাহার ভাষা, এত নীরস যে তাহাতে রমণীসুলভ কোন মধুরতা নাই। আর এরূপ না হইলে তাহারা নিত্য-বহুল-রহস্যময়ী অসংখ্য ঘটনাপূর্ণ বাদসার রঙ্গমহালে শান্তি রক্ষার ভার পাইবে কেন?

আমাদের বর্ণনা করিতে যতক্ষণ লাগিল, উল্লিখিত কাজগুলি সম্পন্ন হইতে তাহার এক চতুর্থাংশ সময়ও লাগে নাই।

জুমিয়া বাদসাহের সম্মুখে আসিয়া, আভূমিপ্রণত কুর্ণীস করিয়া বলিল—"সাহান্-সা—এই বাঁদীর নিকট কেবল এই দুইটী জিনিস পাইয়াছি।"

বাদসাহ ক্রুদ্ধ স্বরে জুলিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাঁদীর বাঁদী হইয়া তুই আমার সম্মুখে যেরূপ অশিষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছিস, তাহাতে তোর এখনিই শিরচ্ছেদ করা উচিত। কিন্তু সে সংকল্প আমি ত্যাগ করিয়াছি। তুই যদি অকপটভাবে আমার সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিস্, তাহা হইলে তোকে মার্জ্জনাও করিতে পারি। বল—এ পত্র কার?"

"সাহাজাদার।"

"সাহাজাদার এ পত্র লইয়া এত রাত্রে কোথায় যাইতেছিলি?"

"আতমাদ্ উদ্দৌলার কন্যার নিকট।"

"এতরাত্রেও কি তাহারা জাগিয়া আছে—"

"আছে। তাহা জানিয়াই আমি যাইতেছিলাম।"

"কি করিয়া জানিলি?"

"মধ্যাহ্নে আমি আর একজন বাঁদীকে পাঠাইয়া সংবাদ পাইয়াছি আজ তাঁহাদের বাটীতে একটা উৎসব আছে।"

"এ পত্র লিখিল কে?"

"সাহাজাদা—"

"আতমাদ্-উদ্দৌলার কন্যা মেহের-উন্নিসার উদ্দেশ্যে এ পত্র লিখিত—"

"জনাবালি—এইরূপ বিবেচনাই করি।"

"এ মুক্তাহার কার?"

"সাহাজাদার।"

"এ হার কোথায় লইয়া যাইতেছিস্—"

"সাহাজাদা হুকুম করিয়াছেন—এই হার ও পত্র মেহের-উন্নিসাকে দিতে।"

"কি সাহসে তুই এ কাজে অগ্রসর হইলি?"

"জনাব! যিনি অন্নবস্ত্র জোগাইতেছেন—যাঁর আশ্রয়ে আমি প্রতিপালিত—তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার আমার ক্ষমতা কই?"

"সব বুঝিয়াছি! তোর এ অপরাধের বিচার পরে করিব। এ ব্যাপারে আমার পুত্র সুলতান সেলিম, প্রথম অপরাধী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার অপরাধের বিচার শেষ হইবে—ততক্ষণ তোকে কিছুই বলিব না। কিন্তু বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, তুই সাহাজাদার মহলে যাইতে পারিবি না। আমি তোকে এক সপ্তাহের জন্য কারারুদ্ধ করিলাম।"

জুলিয়া বাদসাহের পদপ্রান্তে বসিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"সাহান-সা! এ ব্যাপারে আমার কোন হাত নাই। আজ্ঞার অধীন বাঁদী আমি।"

আকবরসাহ গম্ভীরমুখে বলিলেন—"তা সত্য! কিন্তু এখন যদি তোকে সেলিমের মহলে যাইতে দিই তাহা হইলে আমার একটা গভীর উদ্দেশ্য বিফল হইবে। প্রহরীদের উপর আদেশ থাকিবে, তাহারা তোকে কোন কষ্টই দিবেনা।"

জুলিয়া এ কথায় যেন একটু আশ্বস্ত হইল। সে বাদসাহের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল—"সাহান-সা! খোদার প্রতিনিধি! খোদা আপনার মঙ্গল করুন।"

আকবরসাহ, তাতারী-প্রহরীদের ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা জুলিয়াকে তাহাদের প্রধানার নিকট লইয়া গেল। অভাগিনী জুলিয়া হিরণ-মিনারের নিকট এক অন্ধকারময় কক্ষে অবরুদ্ধ হইল! আকবর-সাহ, মন্ত্রপুত ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রবেগে নিজের মহলে প্রবেশ করিলেন।

জুলিয়া কারাগারে। অদৃষ্টের অপূর্ব্ব খেয়ালে, তাহার জীবনে যাহা কখনও ঘটে নাই, আজ তাহা ঘটিল। জুলিয়া মনে মনে ভাবিল—

"আমি রাজকন্যা হইয়া যে কষ্ট ভোগ করিতেছি—এই যে অনাথার ন্যায় পথে পথে বেড়াইয়া—বাদসার অন্তঃপুরে বাঁদীগিরি করিতেছি, ইহার কারণ কে?" তাহার মন হইতেই উত্তর আসিল—"সাহাজাদা সেলিম।"

জুলিয়া—মনে মনে বলিল—"হায় মেহেরবান খোদা! তোমার বিচারের নিকট ত—বাঁদী আর সাহাজাদায় কোন ভেদ নাই। আমি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া এই গভীর রাত্রে বাহির হইয়াছি। বাদসাহের চক্ষে পড়িব বলিয়াই—সেলিমের এ গুপ্ত-রহস্যময় পত্র সহজে বাহির করিয়া দিয়াছি। খোদা—তুমি যাহাদের বড় করিয়াছ, তাহারা যে অত্যাচার করিয়া শাস্তি পাইবে না—ইহা ত তোমার বিধান নয় প্রভু! আমার বাসনা পুর্ণ কর। আমার পিতাকে হত্যা করিয়া, আমার মাকে পথের কাঙ্গালিনী করিয়া—রাজরাণীকে ভিখারিণী করিয়া, এই সাহাজাদা সেলিম যে পাপ করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে দাও প্রভু!"

জুলিয়ার হৃদয়কন্দর হইতে এই সমস্ত অভিশাপ বাক্য সমুত্থিত হইয়া সেই অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে—অতি মৃদু ভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আর সে করুণ প্রার্থনা যে সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী শক্তিময় ঈশ্বরের চিরপ্রখর শ্রুতিপথে পৌছিয়াছিল তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। কেন যে একথা বলিতেছি, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনায় প্রমাণিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

"জনাব! যিনি অন্নবস্ত্র জোগাইতেছেন—যাঁর আশ্রয়ে আমি প্রতিপালিত—তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার আমার ক্ষমতা কই?"

"সব বুঝিয়াছি! তোর এ অপরাধের বিচার পরে করিব। এ ব্যাপারে আমার পুত্র সুলতান সেলিম, প্রথম অপরাধী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার অপরাধের বিচার শেষ হইবে—ততক্ষণ তোকে কিছুই বলিব না। কিন্তু বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, তুই সাহাজাদার মহলে যাইতে পারিবি না। আমি তোকে এক সপ্তাহের জন্য কারারুদ্ধ করিলাম।"

জুলিয়া বাদসাহের পদপ্রান্তে বসিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"সাহান-সা! এ ব্যাপারে আমার কোন হাত নাই। আজ্ঞার অধীন বাঁদী আমি।"

আকবরসাহ গম্ভীরমুখে বলিলেন—"তা সত্য। কিন্তু এখন যদি তোকে সেলিমের মহলে যাইতে দিই তাহা হইলে আমার একটা গভীর উদ্দেশ্য বিফল হইবে। প্রহরীদের উপর আদেশ থাকিবে, তাহারা তোকে কোন কষ্টই দিবেনা।"

জুলিয়া এ কথায় যেন একটু আশ্বস্ত হইল। সে বাদসাহের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল—"সাহান-সা! খোদার প্রতিনিধি! খোদা আপনার মঙ্গল করুন।"

আকবরসাহ, তাতারী-প্রহরীদের ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা জুলিয়াকে তাহাদের প্রধানার নিকট লইয়া গেল। অভাগিনী জুলিয়া হিরণ-মিনারের নিকট এক অন্ধকারময় কক্ষে অবরুদ্ধ হইল। আকবর-সাহ, মন্ত্রপূত ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রবেগে নিজের মহলে প্রবেশ করিলেন।

জুলিয়া কারাগারে। অদৃষ্টের অপূর্ব্ব খেয়ালে, তাহার জীবনে যাহা কখনও ঘটে নাই, আজ তাহা ঘটিল। জুলিয়া মনে মনে ভাবিল—

"আমি রাজকন্যা হইয়া যে কষ্ট ভোগ করিতেছি—এই যে অনাথার ন্যায় পথে পথে বেড়াইয়া—বাদসার অন্তঃপুরে বাঁদীগিরি করিতেছি, ইহার কারণ কে?" তাহার মন হইতেই উত্তর আসিল—"সাহাজাদা সেলিম।"

জুলিয়া—মনে মনে বলিল—"হায় মেহেরবান খোদা! তোমার বিচারের নিকট ত—বাঁদী আর সাহাজাদায় কোন ভেদ নাই। আমি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া এই গভীর রাত্রে বাহির হইয়াছি। বাদসাহের চক্ষে পড়িব বলিয়াই—সেলিমের এ গুপ্ত-রহস্যময় পত্র সহজে বাহির করিয়া দিয়াছি। খোদা—তুমি যাহাদের বড় করিয়াছ, তাহারা যে অত্যাচার করিয়া শাস্তি পাইবে না—ইহা ত তোমার বিধান নয় প্রভু! আমার বাসনা পুর্ণ কর। আমার পিতাকে হত্যা করিয়া, আমার মাকে পথের কাঙ্গালিনী করিয়া—রাজরাণীকে ভিখারিণী করিয়া, এই সাহাজাদা সেলিম যে পাপ করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে দাও প্রভু!"

জুলিয়ার হৃদয়কন্দর হইতে এই সমস্ত অভিশাপ বাক্য সমুত্থিত হইয়া সেই অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে—অতি মৃদু ভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আর সে করুণ প্রার্থনা যে সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী শক্তিময় ঈশ্বরের চিরপ্রখর শ্রুতিপথে পৌছিয়াছিল তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। কেন যে একথা বলিতেছি, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনায় প্রমাণিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

নাট্য-লীলায় নূতনত্ব।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

সুপ্রসিদ্ধ নটকবি ও নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু দীর্ঘকাল পরে "খাস দখল" নামক একখানি অভিনব নাট্যলীলা রচনা করিয়াছেন,—এ সংবাদ নাট্যমন্দিরের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। গত ১৭ই চৈত্র শনিবার 'ষ্টার' থিয়েটারে অমৃত বাবুর নাট্যলীলা প্রথম অভিনীত হইয়াছে। এই নাট্যলীলায় অমৃত বাবু নিপুণ তুলিকায় সম্পূর্ণ নূতন ছবি আঁকিয়াছেন, নূতন উচ্ছ্বাস ছুটাইয়াছেন, নাট্যলীলায় নূতনত্ব দেখাইয়া জনসাধারণকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছেন। সকল রকমে সকল বিষয়ে এমন নূতনত্ব নাট্যজগতে বুঝি আর কখনও দেখি নাই।

নূতন নাট্যাভিনয়ের বিজ্ঞাপনে এবার অমৃতবাবু জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া যে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। আমরা এস্থলে তাঁহার অন্তরের সেই ভাবময়ী উক্তিটুকু উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অমৃত বাবু লিখিয়াছিলেন,—

"আজ শ্রীরামনবমী,—উনিশ বৎসর বয়সে সাধারণ নাট্যশালার দ্বার প্রথম উদঘাটনের দিন হইতে নাট্য-জীবন আরম্ভ করিয়া আজ আমার একোনষষ্ঠী বৎসর বয়স সম্পূর্ণ হইল, এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল নট, নাট্যকার ও সূত্রধাররূপে আপনাদের নিকট কত উৎসাহ, কত আদর, কত ক্ষমালাভ করিয়া যে কি কোমল কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ আছি তাহা আর কি বলিব। আজ প্রায় ছয় বৎসর হইল নানা কারণে আমি নাট্যকাররূপে সুধীগণের সম্মুখে উপস্থিত হই নাই, আজ তাই বড় ভয়ে-ভয়ে হৃদয়ের স্পন্দন কর-পেষণে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিয়া—এই "খাস-দখল" লইয়া আপনাদের সম্মুখে অবনত

চোরবাগানের "অবৈতনিক আর্য্য নাট্য-সমাজ" কর্ত্তৃক অভিনীত
"বাণ-বিজয়" নাটকের একটি দৃশ্য—শিব দুর্গা ও নন্দী।
(গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে নাট্য-মন্দির সম্পাদকের ভবনে
উক্ত সম্প্রদায় এই নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন।)

মস্তকে, দণ্ডায়মান ;—আমার নিজের লেখার গুণের উপর আমার বিশ্বাস স্বল্প, এক ভরসা অভিনেতৃগণের প্রয়াস ও আপনাদিগের সহানুভূতি ;—সহৃদয় দর্শকের সাহায্য না পাইলে কখন কোন অভিনয়ই সাফল্য লাভ করেনা।" - বলা বাহুল্য, নাট্যরসপিপাসু নাট্যানুরাগী দর্শকগণ অমৃতবাবুর নূতন নাট্যকৌতুক উপভোগ করিবার জন্য সাগ্রহে 'ষ্টার' থিয়েটারে সমবেত হইয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই অভিনয় দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "বসুমতী" যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাহার দুই চারি স্থান উদ্ধৃত করিলাম।—

"গত শনিবার ষ্টার থিয়েটারে "খাস দখল" নামক একখানি নূতন কৌতুকনাট্যের অভিনয় দেখিয়া বহুকাল পরে আমরা আন্তরিক তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। যাঁহার "তিলতর্পণে" গৌড়সমাজের 'আব্রহ্মস্তম্ব' তৃপ্ত হইয়াছিল, যাঁহার "বিবাহ-বিভ্রাটে" সমগ্র বঙ্গে সমাজ-চিন্তার কৌতুক-ফেনকিরীটী তরঙ্গ উঠিয়াছিল, যাঁহার "বাবু", "কালাপানি" প্রভৃতি 'নিতুই নব' রঙ্গনাট্যের কলহাস্যে বাঙ্গলার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত—প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, সেই রসিক-চূড়ামণি অমৃতলাল বহুদিন—প্রায় ছয় বৎসর এক প্রকার অজ্ঞাতবাস করিয়া গত শনিবার আবার নূতন নাটিকা লইয়া ষ্টারের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অমৃতবাবুও বাঙ্গালার কৌতুকনাট্যের ক্ষেত্র আবার খাসদখল করিলেন। তাঁহার এই পুনঃ প্রবেশে বাঙ্গালীর হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। * * * অমৃতলাল নূতন দৃশ্য-কাব্য 'খাস-দখলে' ও তাঁহার সেই 'স্ব-রূপ' অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু 'খাস-দখলে' কবি অমৃতলাল—নাট্যকার অমৃতলাল, সমালোচক অমৃতলাল, সামাজিক ও স্বদেশ-প্রেমিক

অমৃতলাল সম্পূর্ণ নূতন পথের পথিক হইয়াছেন। 'খাস-দখলে' সেই চির-পরিচিত, চিরপ্রিয় প্রতিভার দীপ্তি দেদীপ্যমান। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার অভিব্যক্তি অনুরূপ। অমৃত বাবুর প্রয়াস ও যত্ন সফল হইয়াছে। তাঁহার এই নূতন সৃষ্টি তাঁহার কবি-যশের উপযুক্ত হইয়াছে। 'খাস-দখল' চটুল-চাটুময়ী নাটিকা। রঙ্গে ও রসে, কৌতুকে ও বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে ও শ্লেষে ইহার আদ্যোপান্ত সমুজ্জ্বল।—পক্ষান্তরে, অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় করুণরসের পূতধারা 'খাস-দখলে' নাটকীয় গুণ-গৌরবের আরোপ করিয়াছে। * * * 'খাস-দখলে'র সার-সঙ্কলন করিব না।—সে গল্প ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। নিপুণ কবি আখ্যান-বস্তুর রহস্য উপসংহার পর্য্যন্ত সুকৌশলে রক্ষা করিয়াছেন। কৌতুক-বিদ্রূপ-শ্লেষপুষ্পিতা রস-রচনা মাধবীলতার মত আখ্যানবস্তুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। উভয়ের মিলনে উভয়ের সৌন্দর্য্য সার্থক ও চরিতার্থ হইয়াছে।—আখ্যান-বস্তুর সঙ্ক্ষিপ্তসারে সে সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার উপায় নাই। কৌতূহলী পাঠক! স্বয়ং তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন। * * * 'খাস দখল' গানের গোলকুণ্ডা। 'খাস দখল' পাকা বুলীর রত্নাকর। সে বেলোয়ারী বোলোয়ারীর পরিচয় সংক্ষেপে দিবার উপায় নাই। কিন্তু গানের গোলকুণ্ডা হইতে আমরা দুইখানি উজ্জ্বল হীরক পাঠক-দিগকে উপহার দিব। রুচিবাগীশ, সাবধান! চির-বিরহিনী, স্বামি সুখে-চির-বঞ্চিতা—গ্রাম্যবালিকা গিরির 'ভর্ত্তৃ শব্দের অপভ্রংশ' অর্থটি নাই। তাহাই যে তাহার জীবন-সম্বল। গিরি গাহিয়াছিল,—

ওগো কেউ বলনা-গো ভাতার কেমন মিষ্টি!
আমার শুধু হয়েছিল ছেলে বেলা ছেলে-খেলা—করে শুভদিষ্টি!'
মিষ্টি গুড় মিষ্টি চিনি আর মিষ্টি—মধু,
কিসের মত মিষ্টি হাঁগা! সাতটী পাকের বধু,

সে কি তেষ্টার জল, চেষ্টার ফল, না অভিমানে ছকুর বেলা বিষ্টি !
মিষ্টি ছিল বাবার আদর, আর মায়ের কোল,
ফাগুন মাসে ফাগের খেলা, কচি আমের ঝোল,
তার চেয়ে কি মিষ্টি ভাতার—নারীর ধর্ম্ম কর্ম্ম ইষ্টি ;—
কত মিষ্টি সেই বিধাতা যার মিষ্টি ভাতার ছিষ্টি !

এ গান 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছিল।' আর আমাদের প্রাণ আকুল করিয়াছিল। বহুদিন এমন গান শুনি নাই! বালিকা-হৃদয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আকুলতা,—সাধ, সোহাগ ও কামনার এমন সরল সুন্দর স্বাভাবিক অথচ কবিত্বময় অভিব্যক্তি আধুনিক সাহিত্যে বিরল। গিরির আর একটি গান,—

মুখটি আমার বুকে নেই তার, নামটি আছে মনে।
সেই নামটি দিবানিশি ফিরছে আমার সনে॥
আমি উঠি বসি যাই শুতে বিছানায়,
নাম সঙ্গে উঠে সঙ্গে বসে সঙ্গে শুতে যায়,
নাম কত কথা সুধায় আমায় গেলে পরে নির্জ্জনে॥
নাম আমার জপমালা, জুড়ায় জ্বালা,
আমার সিঁতের সিঁদুর, হাতের বালা,
নাই বিরহ অহরহ মধুর মোহ নামের লাপনে ;—
আমি নামের প্রেমে সুখে আছি অনেক দাহ দেহের মিলনে॥

হিন্দুনারীর দাম্পত্য-জীবনের ইহাই আদর্শ। ইহা খাঁটি বাঙ্গলার খাঁটী ভাব। এ ভাব এ দেশেই সম্ভব। অমৃত বাবু অমৃতময়ী ভাষায় বাঙ্গালা দেশে সেই ভাবের ঝঙ্কার তুলিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। 'খাস্-দখলে'র অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। নিতাইচরণ, মোহিত, ঠাকুরদাদা, গিরিবালা, মোক্ষদা প্রভৃতি অভিনয়-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। খাসদখলের "কলের পুতুল"

গ্রামোফোন। 'খাস-দখলে' বহু সামাজিক সমস্যার প্রসঙ্গ আছে। সে সকলের আলোচনা করিব না। সামাজিক প্রশ্নে যাঁহারা অমৃত বাবুর সহিত একমত হইতে পারিবেন না, তাঁহারাও 'খাস-দখলে' উপভোগের বস্তু ও আনন্দের অবকাশ পাইবেন। রস রচনার পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। অমৃতবাবুর লেখনী অমর হইয়া থাকুক। বাঙ্গালী যদি 'খাস-দখলে'র সমাদর না করে, তাহা হইলে বলিব, বাঙ্গালা দেশে রসিকতা ও রসের কথার কাল গিয়াছে।"

এই তো গেল, নাটক ও অভিনয়ের নূতনত্বের কথা। অভিনয়ের আড়ম্বরে—প্রোগ্রামখানি পর্য্যন্তও নূতন ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। 'খাস-দখলের' প্রোগ্রাম খানিও যেন এক খানি ছবি। তাহাতেও কবিত্ব—কৃতিত্ব এবং নূতনত্বের ছড়াছড়ি। পাঠকগণের কৌতূহল দূর করিবার জন্ত তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।—

ষ্টার থিয়েটার।

কলিকাতা।

নাট্যাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু "প্রণীত"

নাট্যলীলা

খাস-দখল।

ঘটনাস্থল—কলিকাতা। কাল—বর্ত্তমান।

প্রথম অভিনয় রজনী—১৭ই চৈত্র, ১৩১৮।

পাত্র-পাত্রীর পরিচয়।

পূর্ব্বরঙ্গ।

পুরুষ। স্ত্রী।

কলিরাজ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে।

তপস্বীরাম বিষ্ণুচরণ দে। রতি শ্রীযুক্তা রাণীসুন্দরী।

পুরুষগণ।

নিতাইচরণ ঘোষাল (দায়ে পড়ে সব্-এডিটার) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

মোহিতমোহন রায় (জিনিয়স্-কবিবর) „ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মনমোহন মাইতি (রাজর্ষি) „ কাশীনাথ চট্টো।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যো (লোকেনের আত্মীয়) „ ক্ষেত্রমোহন মিত্র।

ঠাকুর-দা মহাশয় (সম্ভ্রান্ত প্রাচীন) „ কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।

লোকেন্দ্রনাথ চক্র (উন্নতিশীল উকিল) „ গোপালদাস ভট্টা।

রমেশচন্দ্র পালিত (জুনিয়র উকিল) „ হীরালাল দত্ত।

সারদাচরণ চট্টো (মোক্ষদার ভ্রাতা) „ শশীভূষণ বসু, (অমৃত বাবুর পুত্র)

মহামোহপদধ্বয় আনন্দমোহন সেন (কবিরাজ) „ রাধাকিশোর কর।

ডাঃ ডি, মিত্র | | লক্ষ্মীনারায়ণ মুখো।
„ ব্যানার্জ্জী | | ঘনশ্যাম বিশ্বাস।
যাদুধন মল্লিক | স্বনামধন্য ডাক্তারগণ। | জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ।
গুণধর ঘোষ | | ধীরেন্দ্রনাথ মুখো।
পাকড়াশী | | কার্ত্তিক চন্দ্র দে।

স্ত্রীগণ।

শ্রীমতি মোক্ষদাসুন্দরী চক্র (লোকেনের স্ত্রী) „ শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী।

„ গিরিবালা দেবী (মোক্ষদার-আশ্রিতা) „ সুশীলাবালা।

„ বিধু (পরিচারিকা) „ মৃণালিনী।

„ আহ্লাদী	(ঝি)	„ কুমুদিনী।
„ লাবণ্যলতা লাহিড়ী	(শিক্ষিতা-মহিলাগণ)	„ কোহিনুরবালা।
„ মহালক্ষ্মী মুন্সী		„ পান্নারাণী।
„ বিভাষ মজুমদার		„ হেমন্তকুমারী।
„ মৃণালকুমারী মিত্র		„ নলিনীবালা।

শিবু সাহেব, বরচন্দ্র, তোত্‌লা-প্যারী, খোঁড়া-নেপাল, সেবকরাম, গোকুল, ভদ্রলোকত্রয়, রাধা, পুষ্প, চারু, ব্রতি-সঙ্গিনীগণ, গোয়ালিনীগণ ইত্যাদি।

পূর্ব্বরঙ্গ।

কলিরাজের শিষ্যগ্রহণ ও নবসংস্কারের আয়োজন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমাজ চিন্তা, অভ্যাগতগণের সহিত শিষ্টাচারের মধ্যেও লোকেনের ইষ্টদেবী চিন্তা, মোহিতের রচনাপ্রণালী ; ইংরাজী-নবিশ নিতাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বশীকরণ মন্ত্র।

তৃতীয় দৃশ্য।

মোক্ষদার মাধুরী বৈচিত্র ; মোহিতের সুখ ও অসুখ ; একটী কলের পুতুল ; ডাক্তার মিত্রের ডাক্তারি শিক্ষা, ঠাকুরদাদার ভালবাসা, লোকেনের মামলা রুতে ও বিশ্রাম।

চতুর্থ দৃশ্য।

নিতাই ঠাকুরদা সংবাদ, গ্রাম্য-পূজা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মহা সমারোহের আয়োজনে কর্ম্মকর্ত্তারা শশব্যস্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পূরিয়া।

তৃতীয় দৃশ্য।

দবির পাপমোচন।

চতুর্থ দৃশ্য।

মিষ্টান্ন-লোভি গিরিলালা;

মোহিতের তুলনায় সমালোচনা।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রমদা-প্রমোদ মেলা; ভগ্ন দূতীদ্বয়ের সাবধানতা;

মোহিতের মাংস ক্ষুধা; ফলার যাটী।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কবি ও পল্লিবাসিনী।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঠাকুরদা'র বুকের বোঝা গেল ;

নিতাই কর্ম্মত্যাগ করিল।

তৃতীয় দৃশ্য।

সৌভাগ্যের তাড়নায় সলিল কি মাটী।

চতুর্থ দৃশ্য।

জমিদারী নিলামে ;

এক—দুই—তি——তি——তি———"খাসদখল"

যবনিকা।

বাঙ্গালার রঙ্গালয়।

(প্রতিবাদ।*)

(শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

মাননীয়

শ্রীযুক্ত নাট্যমন্দির সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়,

গত চৈত্র মাসের "নাট্যমন্দিরে" প্রকাশিত বাঙ্গালার রঙ্গালয় (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) পাঠে বুঝিলাম, লেখক রঙ্গালয় লিখিতে কিছু

---

* মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

রঙ্গরসের অবতারণা করিয়াছেন। আমি সেই রঙ্গ ধরিয়া প্রতিবাদ করিব।

কেবল নাটককারগণই যে নীরস চরিত্রে রসাল গানগুলি জড়িয়ে দেন, তাহা নহে। প্রবন্ধ উপাস্থাস যাহাই পাঠ করা যায়, তাহাতেই দেখা যায় রসাল কিছু আছেই। কেন যে থাকে তাহা গ্রন্থকার বলিতে পারেন, আমরাও একটু একটু পারি বোধ হয়, কিন্তু রঙ্গালয় লেখক মহাশয় তাহা মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যদি নীরস, একঘেয়ে কথাই লেখা থাকে, যদি তাহাতে সপ্তরসের কথঞ্চিৎ অবতারণা করা না হয়, তবে দর্শক কি পাঠক তাঁহারা যতই জ্ঞানী হউন না কেন, অবশ্য বাহিরের দিকে তাঁহাদের একটু চিত্ত চাঞ্চল্য হইবেই হইবে। মনে করুন প্রতাপাদিত্য;—তাহাতে যদি কেবল লাঠির ঠকাঠক ও বীররসের অবতারণাই থাকিত, তবে কোন্ মহাত্মা চারি পাঁচ ঘণ্টা একভাবে বসিয়া তাহা শুনিতেন? তাহাতে আদি, ভক্তি, হাস্য, করুণ প্রভৃতি রস থাকায় ও এক একবার এক এক রূপ পরিবর্ত্তন হওয়ায় দর্শকের মনে যুগান্তর উপলব্ধি হয় না কি? আপনি একখানা নীরস পুস্তক (আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই) একজন জ্ঞানী ও উঁচুদরের পাঠককে পাঠ করিতে দিবেন, শুনিবেন—তিনি পাঠ করিয়া কি বলেন? কিম্বা একখানা নীরস নাটক স্বয়ং প্রণয়ন করিয়া নাট্যরসিক (প্রথমদল) মহোদয়গণ সম্মুখে অভিনয় করাইয়া দেখিবেন—আপনার নাট্যরসিক মহোদয়গণ কি বলেন?

যদিও নাট্যরসিকগণের নিকট রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ যশঃখ্যাতির প্রত্যাশা করেন, অভিনেতৃবর্গ তাঁহাদেরই মুখাপেক্ষী হইয়া অভিনয় চাতুর্য্য প্রদর্শন করেন, যদিও নাটককারগণ তাঁহাদের নিকটই প্রশংসিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় দলের (যাহারা দায়িত্ব জ্ঞানহীন, উদ্দাম আমোদে নিশাযাপন উদ্দেশ্যে রঙ্গালয়ে গমন করেন, তাঁহাদের)

জন্যই রঙ্গালয়ের শ্রীবৃদ্ধি—একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ রঙ্গালয়ে ইহাঁরাই সংখ্যায় বেশী, এবং নাটককারগণ কিম্বা অভিনেতৃগণ ইঁহাদের জন্য কেহ হাস্যার্ণব কেহ রঙ্গরসিক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এমন কি রঙ্গালয়ে যে ভাল ভাল নাটকের সহিত এক একখানা প্রহসন বা রঙ্গনাট্যের অভিনয় হয়, তাহাতেও উহাঁদের কৃতিত্ব বিঘোষিত হইয়াছে। রঙ্গালয় লেখক মহাশয়ের মতে দ্বিতীয় দল কিরূপে রঙ্গালয়ের অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,—বুঝিতে পারি না। আর রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণই বা কেন অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া ইঁহাদের হস্ত এড়াইতে যাইবেন,—বলিতে পারেন কি?

রঙ্গালয়ে বসিলে প্রথম দল ও দ্বিতীয় দল বড় অধিক পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কেননা—যখন হাস্যরসের অভিনয় হয়, তখন প্রথম দলও হাসেন, দ্বিতীয় দলও হাসেন। তবে—কম, বেশী। যখন প্রেমের সঙ্গীত আরম্ভ হয়, তখন প্রথম দলও শ্রবণ করেন। কিন্তু প্রথম দল শোনেন তন্ময় হইয়া (স্বীকার করিতে হইবে), আর দ্বিতীয় দল শোনেন উচ্ছৃঙ্খল আমোদে আমোদিত হইয়া। প্রথম দল যে কেবল দৃশ্যপটের স্বাভাবিকত্ব দেখেন স্বীকার করি। কিন্তু চাক্‌চিক্যে দেখিয়া তো তাঁহারা কোন দিন প্রতিবাদ করেন নাই। বিশেষতঃ কোন্ রঙ্গালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ মহোদয় ইহা দৃশ্যপটের স্বাভাবিক চাক্‌চিক্য না করিয়া,দ্বিতীয় দলের জন্য অস্বাভাবিক চাক্‌চিক্য করিয়াছেন? কোন্ কার্য্যাধ্যক্ষ দৃশ্যপটে মরুভূমে উদ্যান-বাটীকা, শ্মশানে প্রাসাদ-কক্ষ অঙ্কিত করিয়াছেন?

বাস্তবিক দ্বিতীয় দল উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু অভিনয় দর্শনে তাহাদের অনেকের ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে, এমন কি হইয়াওছে। যাঁহারা একদিন বলিদান, সংসার প্রভৃতির অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মতি গতি অনেক ফিরিয়াছে। যাঁহারা বারাঙ্গনা-ভবনে গমন করিতেন,

অভিনয় দর্শনে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রায় সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, রঙ্গালয়ে গমন করিয়া থাকেন। 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে ও অনেক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রতাপাদিত্য দর্শনে কোন্ দল অগ্রে "মা মা" রবে চীৎকার করিয়াছিল—রঙ্গালয়ের লেখক মহাশয় তাহা বলিতে পারেন কি?

বস্তুতঃ রঙ্গালয় লেখকের বেশী দৃষ্টি তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতাদের উপর। লেখকের মতে ইহারাই বেশী উচ্ছৃঙ্খল। দোষী—পূর্ব্ববঙ্গ, দোষী—তাহার ভ্রাতা; উচ্ছৃঙ্খল—পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতাগণ। পূর্ব্ববঙ্গীয় লোক সমূহের নিকট আপনি আর কখনও পরিচিত হইয়াছেন কি? তাহাদিগের প্রতি হিংসা করিতে কবে হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন? আপনি না চেনেন লোক চরিত্র; না বোঝেন নাট্যরস!

যখন মিনার্ভা রঙ্গালয়ে বাণীর বরপুত্র নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় মহাত্মা গিরীশ চন্দ্র ঘোষের "শঙ্করাচার্য্য" অভিনীত হইতেছিল, তখন দর্শকে রঙ্গালয় পরিপূর্ণ ছিল, আপনিও হাজির ছিলেন। লিখিত "শঙ্করাচার্য্য" নাটক অতি সুন্দর ও পবিত্র। দক্ষ অভিনেতৃবর্গের অভিনয় চাতুর্য্যে বাস্তবিকই সে দিন শঙ্করাচার্য্যের যুগ ভাবিয়া দর্শকের ভ্রম্ হইয়াছিল এবং প্রথম দল (নাট্যরসিক) তাহাতে অস্ফুটকণ্ঠে প্রশংসা ধ্বনি করিতেছিলেন (আপনি কিন্তু নয়)! ক্রমে তাঁহারা, যখন তন্ময় হইলেন, তখন আপনার পশ্চাতে পিটের সন্নিহিত দ্বিতীয় দলভুক্ত একদল পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতা পরস্পরের মধ্যে "কোন্ অভিনেতার কি নাম, কোন্ অভিনেত্রীর কত বয়স, কোথায় বাসস্থান" ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। এখন জিজ্ঞাস্য রঙ্গালয় লেখক মহাশয় কোন্ দলভুক্ত? প্রথম দল ভুক্ত নহেন, কেননা তাহা হইলে তিনিও অভিনয় দর্শনে তন্ময় হইয়া থাকিতেন; দ্বিতীয় দলের কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না। আর দ্বিতীয়

দলভুক্ত হইলে, তিনিও ঐরূপ একটা না হয় অন্যরূপ একটা আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতেন; ইহাতে পশ্চাতের কথা শুনিতে পাইতেন না। তবে এখন তিনি কোন দলভুক্ত হইলেন? তৃতীয় দলভুক্ত নিশ্চয়! প্রথম ও দ্বিতীয় দল বাদে আর একটী দল আছে, তাহা তৃতীয় দল। তাঁহাদের কার্য্য, রঙ্গালয়ের ত্রুটী, অভিনেতৃগণের ত্রুটী ও দর্শকগণের ত্রুটি ধরা। যাঁহারা প্রশংসা ও আলোচনার ধার ধারেন না, যাঁহারা অভিনয় দর্শনে যাইয়া কেবল ত্রুটীই লক্ষ করেন এবং তাহা সংবাদপত্রাদিতে ছাপাইয়া কিম্বা লোকের নিকট বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিন্দুক। তাঁহারা যান কেবল দোষ ধরিতে,—গুণ ধরিতে তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা নাই। যদ্যপি কোন অভিনেতা কি অভিনেত্রী কোন অস্বাভাবিক অভিনয় করেন কি চিত্রপটের কোন স্থানে কোন ত্রুটী লক্ষিত হয়, তবেই তাঁহারা উৎফুল্ল হ'ন এবং পর দিবস প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তাহা লিখিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাঁরা তৃতীয় দল ভুক্ত বা নিন্দুক।

সে দিন (যে দিন রঙ্গাসর লেখক উপস্থিত ছিলেন) শঙ্করাচার্য্য মিনার্ভা থিয়েটারের সুযোগ্য কার্য্যাধক্ষের সুপরিচালনে, রঙ্গমঞ্চের কোন দোষ পরিলক্ষিত না হওয়ায়, লেখকের দৃষ্টি দর্শকগণের দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহাতেও বেশী কিছু না পাইয়া, তাঁহার ঠিক পশ্চাতের কয়েকটী অসভ্য মাতালের কীর্ত্তি ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহা ছাপাইয়া নিজকে নিজে গৌরবান্বিত মনে করিলেন। ইহাতে আপনাকে তৃতীয় দলভুক্ত মনে করিলে, আমাদের দোষ হয় কি?

তারপর যখন নর্ত্তকীগণ নাচিতে আসিল, কলকণ্ঠে কোরাসে গান ধরিল—

"ফুল কাননে,
বুকে বুকে মুখে মুখে থাকি দুজনে।"

অমনি লেখকের পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতাদের হৃদয়ের রুদ্ধকপাট উন্মুক্ত হইল, কিন্তু লেখকের চিরবিরুদ্ধ কপাট উন্মুক্ত হইল না—রুদ্ধই রহিল। তারপর যখন সারি বাঁধিয়া নাচিতে নাচিতে সম্মুখে আসিল, অমনি পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতাদের একজন সোল্লাসে বলিয়া উঠিল "চারী আইছে, চারী আইছে, আই. বাম পাখের ছয়ের টি" কথা শ্রবণ মাত্র লেখক হাসিলেন, তাঁহার ভ্রাতাদের নাট্যরস বোধের মাত্রা বুঝিয়া হাসিলেন। দেখিলেন—প্রথম দলও সেই দিকে চাহিয়া আছেন—হাসিবার কথাই তো!

যখন ভ্রাতাদের উপর ক্রোধের মাত্রা বেশী বাড়িয়া উঠিল (এত বাড়িল যে আর স্থান পায় না) তখন নাটককারগণ ও রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি ঘৃণা হইল। কেন নাটককারগণ তাঁহার ভ্রাতাদের জন্য এই সমস্ত গান রচনা করিয়াছেন? কেন নীরস শঙ্করাচার্য্য (যে শঙ্করাচার্য্য আদি, ভক্তি রসের মূলাধার; যাঁহার রচিত গঙ্গাস্তোত্র বঙ্গ সন্তানগণের নিত্য প্রয়োজনীয়, সেই দেব শঙ্করাচার্য্য লেখকের মতে নীরস) চরিত্রে ঐরূপ গান গুলি জুড়িয়া দিয়াছেন, যাহাতে নীরস শঙ্করাচার্য্য সরস হইয়া, তাঁহারই গুণধর ভ্রাতাদের চরিতার্থ করিল? তারপর হৃদয়ের আবেগে নীরব ভাষায় কহিলেন—"হে নাটককার মহাপুরুষগণ! আপনাদের নিকট সানুনয় প্রার্থনা আর রসাল গান লিখিয়া আমার ভ্রাতাদের চিত্ত বিনোদন করিবেন না। হে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ! এখন হইতে আর আমার গুণধর ভ্রাতাদের রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিতে দিবেন না।"

শাস্তি কি শান্তি?

(শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম এ, বি, এল, সরস্বতী লিখিত।)

"শাস্তি কি শান্তি" গিরিশ চন্দ্রের একখানি সামাজিক নাটক। যে বিষয় প্রধানরূপে এই নাটকের ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে বহুজন কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে বিবেচিত হইয়াছে। সে বিষয়টি বিধবা-বিবাহ। মনীষি বিদ্যাসাগরের অনন্ত চেষ্টায় নিস্পন্দ বঙ্গসমাজও একবার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আজিও এ বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই। বিদ্যাসাগর নিজপুত্রের সহিত বিধবার বিবাহ দিয়া দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণেও হিন্দুসমাজ উহা গ্রহণ করে নাই।

"শাস্তি কি শান্তি" সেই চিরন্তন দ্বন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত; একদিকে বিলাসহীনা, পূতচরিত্রা, ব্রতানুষ্ঠানপরায়ণা, স্বার্থহীনা, পরোপকার-নিরতা বিধবার পুণ্যময় চিত্র, অন্যদিকে বিলাসসাগরনিমজ্জিত, কলুষিতান্তঃকরণ, পাপরত ব্যভিচারিণী বিধবার নারকীয় আলেখ্য— হিন্দুসমাজে এ দুইটিই বিদ্যমান। কোন্‌টি রাখিতে কোন্‌টি দূর করিব? গিরিশচন্দ্র স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। তাই নাটকের আখ্যা একটি প্রশ্ন—"বিধবা সম্বন্ধে ঋষিদের যে ব্যবস্থা তা 'শাস্তি কি শান্তি'?"

কিন্তু গিরিশচন্দ্র যে নিজে ইহার একটি সমাধান করিয়াছিলেন, নাটক পাঠেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সে সমাধান এই— "বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত হ'তে পারে, নীতি-সঙ্গত হ'তে পারে। কিন্তু বিধবা-বিবাহ অন্যের বোঝবার নয়, বিধবাই বুঝুক। যদি

শাস্ত্রসঙ্গত হয়, নীতিসঙ্গত হয়, সে বিধবা আপনি বুঝে, ইচ্ছা হয় বিবাহ করুক্। অন্যে তার দরদী হয়ে বিবাহ দিলে পাপগ্রস্ত হবে।" [দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থগর্ভাঙ্ক।]

কিন্তু গিরিশচন্দ্র একদর্শী নহেন। এই সমস্যার উভয়দিকই তিনি সুনিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। যে সকল প্রমাণ বিধবা-বিবাহের দোষ দেখাইতে প্রয়াস পায়, তাহাও একত্রিত করিয়াছেন, আবার যে সকল যুক্তি বিধবা-বিবাহের অনুকূল তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের বিশ্বাস যাহাই হউক, নিজের অনুরাগ যে দিকের হউক, নাটকে তাহা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন নাই। বিপক্ষ বলিতে পারিবে না যে তিনি বিপক্ষের দোষই দেখাইয়াছেন। তিনি নিজের দোষও দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। একাদশীর দিন বালিকা কন্যা নিরাহারে আছে, প্রসন্নকুমার নিজের আহার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সমাজের এই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি তীব্রমত প্রকাশ করিলেন—"এ কি যন্ত্রণা! আগে চিতের চেপে ধ'রে যে পুড়িয়ে মারতো, সে যে ছিল ভালো। দিন দিন একি যন্ত্রণা! সন্তানের দিন দিন এ কষ্ট কি ক'রে দেখবো। এই কি হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম! এই কি লোকাচার! এই কি হিন্দুর কোমলতা! এ অধর্ম্ম, এ নরহত্যা, এ বালিকা-হত্যা।" [দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক] ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এ নিষ্ঠুর আচারে গিরিশচন্দ্রের সহানুভূতি নাই। তবে এ আচারের উৎপত্তি বিলাস-বর্জ্জন হইতে অভ্যাসে অতি কঠোর আচার সহ্য করিতে রমণীগণ কোন রকমে সমর্থ হয়। এই বিলাস-বর্জ্জনই বিধবার মুখ্য প্রয়োজনীয়। তাই হরমণির মুখ দিয়া নাট্যকার বলাইয়াছেন—"যার পুরুষের আশ্রয় নেই, তারে সদাই সতর্ক থাকতে হয়। পোড়া বিলাসই ভুবমন ডেকে আনে।" [দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক] এই বিলাসচ্ছিদ্রে